নাটক

শ্রী সমরেশ সেন

প্রণীত অন্যপুস্তক *

* কিশলয় বোধিকা - ১ম ভাগ

[illegible]

কিশলয় বোধিকা - ২য় ভাগ *

[illegible]

* কিশলয় বোধিকা - ৩য় ভাগ

[illegible]

THE PEACOCK ENGLISH PRIMER

FOR CLASS II * *

THE PEACOCK ENGLISH READERS

* * (BOOK I) FOR CLASS - IV

THE PEACOCK ENGLISH READERS

(BOOK - II) FOR CLASS - V * *

[illegible] *

* * [illegible]



[illegible]

ভূমিকা

মুখ্যতঃ ধর্মের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা বড় করিয়া দেখিয়াছি ; কিন্তু আজ তাঁহার শতবার্ষিকীতে তাঁহার জীবন ও বাণী পর্যালোচনা করিয়া আমরা ক্রমেই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছি, যে-ধর্মের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা পারমার্থিকতার কোনও সংকীর্ণ ক্ষেত্র নয়, তাহা সমগ্র জীবনকে উদ্বোধিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখে যে ধর্ম সেই ধর্ম। তাঁহার সেই উদাত্ত আহ্বানের জীবন ও বাণীকে আজ আমরা গানে কবিতায় জীবনীতে নাটকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। নাট্যকার শ্রীপরেশ ধর মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ছবি রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই 'বিবেকানন্দ' নাটক খানির ভিতরে।

'বিবেকানন্দ' নাটকখানি তিনটি অঙ্কে রচিত। প্রথম অঙ্কে নাট্যকার বিবেকানন্দের শৈশব ও কৈশোরের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন ; দ্বিতীয় অঙ্কে যৌবনের চিত্র—যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ; তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার বিবেকানন্দের বিদেশ ও আমেরিকায় প্রথম অভিজ্ঞতা ও বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তাঁহার যোগদানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অল্প আয়তনের মধ্যে বিবেকানন্দের জীবনের এতগুলি দিক্ ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে বলিয়া নাট্যকারকে বিবেকানন্দের জীবনমহিমার সংকেত বহন করে এমন সব বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেই নির্বাচিত করিয়া লইতে হইয়াছে। এই নির্বাচিত ঘটনাগুলি সম্বন্ধেও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। নাটককে শুধু জীবনী হইয়া উঠিলে চলিবে না ; এখানে ঘটনা চাই, খানিকটা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত চাই, মুখ্য চরিত্রের সঙ্গে আশপাশের কতকগুলি পার্শ্ব চরিত্র ফুটিয়া

ওঠা চাই, ঘটনাসংকেতবাহিত্বের ভিতর দিয়া সংলাপের মধ্যে নাটকীয়ত্ব চাই। এই সকল জিনিস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নাট্যকারকে বিবেকানন্দের জীবন তথ্যগুলিকে স্থানে স্থানে একটু বিস্তার করিয়া লইতে হইয়াছে। নাটকীয় প্রয়োজনে এই বিস্তার যাহাতে বিবেকানন্দের জীবন-সত্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ বা বিকৃত না করে সেদিকে নাট্যকার সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

নাট্য-প্রয়োজনে নাট্যকারকে আরও একটি কাজ করিতে হইয়াছে। নাটকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন তিনটি অঙ্কে বিবেকানন্দের ঘটনাবহুল জীবনের ত্রিশটি বৎসরকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইয়াছে; নাটকে বর্ণিত ঘটনার ভিতর দিয়া এই ত্রিশ বৎসরের ঘটনা পরিণতির অবিচ্ছিন্ন সূত্রটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই; তাই ঘটনার ভিতরকার কালগত দীর্ঘ ব্যবধানকে নেপথ্যবিবৃতির সাহায্যে ভরিয়া লইতে হইয়াছে।

এই অল্প পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন যুগের নির্বাচিত কতকগুলি ঘটনাকে যে একটি নাট্যরূপ দান করিতে পারিয়াছেন নাট্যকারের ইহাই কৃতিত্ব; এই কৃতিত্ব আরও চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের লোকোত্তর চরিত্রের চিত্রণে। সমস্ত কথা ও কাজকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিবার কোনও সুযোগ নাই, প্রতিনিধি স্থানীয় কতকগুলি ঘটনার শুধু চিত্রণে আভাসে ইঙ্গিতে চরিত্রটি ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। এই কাজের সফলতাতেই নাটকখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সংলাপগুলিও বিভিন্নচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

নাটক খানিকে মঞ্চস্থ করিবার প্রযুক্তিকৌশল নাট্যকার নাটকখানির ভিতরেই যথেষ্টপরিমাণে দিয়াছেন। স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত হওয়ায় স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের পক্ষেও নাটকখানি মঞ্চস্থ করা সহজ হইবে। এই জাতীয় নাটকের বহুল প্রচার বিশেষরূপে কাম্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়.

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

নাট্যকারের বক্তব্য

যাঁরা আমার এই নাটকখানি অভিনয় করার কথা ভাবছেন, তাঁদের কাছে আমি কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই। অনেকে পূর্ণাংগ বড় নাটক পছন্দ করেন, আবার অনেকে চান ছোট ব একাংক নাটক। বর্তমান নাটকখানি এই দু'দল লোকেরই চাহিদ মেটাতে সক্ষম। কেন, সেই কথাই বলছি।

যাঁরা পূর্ণাংগ নাটকের পক্ষপাতী, তাঁদের কাছে কিছু বলার নেই। "বিবেকানন্দ" নাটকের সমগ্র অংশ মঞ্চস্থ করে তাঁরা তৃপ্তি পাবেন। আর যাঁরা ছোট নাটক চান, তাঁরাও তাঁদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ পেয়ে যাবেন এই নাটক থেকেই। "বিবেকানন্দ' কাল্পনিক কাহিনী-নাটক নয়। এটা জীবনী-নাটক। সুতরাং যে সব অংশের সমন্বয়ে এর সামগ্রিক অখণ্ড নাট্য প্রবাহ, তার প্রায় প্রত্যেকটি অংশ নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একটি ছোট ছোট স্বয়ং-সম্পূর্ণ নাটক। যেমন, প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য। এটি নাটকের পূর্ণ লক্ষণ বিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণ একাংক নাটক। ছোটরাও এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করে প্রচুর আনন্দ পাবে। বড়রা ত পাবেনই। দ্বিতীয় অংকের প্রত্যেকটি দৃশ্য বা একাধিক দৃশ্যকে এক সংগে একটি ছোট নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ করা চলতে পারে। আবার শুধুমাত্র তৃতীয় অংকটিকেও একটি সম্পূর্ণ নাটক হিসেবে ব্যবহার করলে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একাংক নাটকের মর্যাদা পাবে। যাঁরা এই ভাবে "বিবেকানন্দ" এর অংশ বিশেষকে ছোট ছোট নাটক হিসেবে অভিনয় করবেন, তাঁরা নিজেদের খুশিমত ঐ অংশগুলোর নামকরণ করে নিতে পারেন। এতে নাট্যকারের কোন আপত্তি নেই।

যাঁরা সমগ্র নাটকখানি অভিনয় করতে ইচ্ছুক, অথচ এর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কলেবরের জন্য কিছুটা চিন্তিত, তাঁদের একটা কথা বলতে চাই। তাঁরাও অনায়াসে নাটক খানিকে ছোট করে নিতে পারেন। দ্বিতীয় অংকের একাধিক দৃশ্যের প্রয়োজনানুসারে সুসংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী দিয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যে চলে গেলে নাটকের রস তেমন কিছু ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ আকারেও ছোট হবে।

নাটকখানি এই ভাবে লিখতে যিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনি হলেন গভীর রসদৃষ্টি সম্পন্ন শিল্প-প্রেমিক শ্রীযুক্ত সুশীল করণ। তিনি সমস্ত রকম পুঁথিপত্র জুগিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। নাটকখানি প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে বেলুড় মঠের স্বামী প্রমথানন্দ ও উদ্বোধন কার্যালয়ের স্বামী সুশান্তানন্দের সহায়তায় আমি অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। আর যে দুজন আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় ভরত মহারাজ এবং শ্রীযুক্ত রামকানাই ভট্টাচার্য। যাঁদের নামোল্লেখ করলাম, ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের কাউকে আমি ছোট করব না, কেননা তাঁরা সকলেই মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ-পূজারী এবং নাটক রচনার ব্যাপারে আমাকে তথ্য জুগিয়ে তাঁরা সেই পবিত্র পূজা সমাপন করেছেন।

৭, ফকির চক্রবর্তি লেন
কলিকাতা—৬,
১লা শ্রাবণ, ১৩৬৩ সাল

পরেশ ধর।

উৎসর্গ

স্বর্গগতা ঠাকুমার স্মৃতির উদ্দেশে

মহৎ বাণী

সৎ কথার নিজস্ব শক্তি চিরকালই আছে, চিরকালই থাকবে। কিন্তু যেখান থেকে কথাটা আসছে, সেই স্থানটা যত পবিত্র হবে, যত নিষ্কলুষ হবে, লোকে কথাটার তত মূল্য দেবে।...একজন ত্যাগী বিবেকানন্দের মুখে উপদেশ-বাণী শুনে লোকে তার যে মূল্য দেবে, একজন কবি বায়রনের মুখে সে কথা শুনে লোকে কি সে মূল্য দিতে চাইবে? একজন মহাকবির রচনায় হয়ত ত্যাগ-সাধনার, পরার্থে প্রাণ দানের অনুকূল বহু কথা আছে। তাতেই কি সহস্র সহস্র লোককে সর্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রণোদিত করতে পারা যাবে? কিন্তু নিজের জীবন যদি সর্বস্ব ত্যাগের জীবন হয়, তাহলে তেমন ব্যক্তির এক একটা কথায় শত সহস্র লোক যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ করে দেশের জন্য, দশের জন্য কাঙাল সাজতে পারে, চির-দারিদ্র্য, চির-দুঃখ, চির-অভাব বরণ করতে পারে।

—শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

(অখণ্ড সংহিতা, প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয়ার্ধ)

চরিত্র লিপি

(স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত)

।। বিলে ।। নরেন (বিবেকানন্দ) ।। (বিশ্বনাথ দত্ত ।। ভোলা ।।
বাউল ।। সন্ন্যাসী ।। রাম কাকা ।। সুরেন মিত্র ।। অন্নদা ।।
রামকৃষ্ণদেব ।। লাটু ।। হাজরা ।। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি ।।
।। আমেরিকান ভদ্রলোক ।। জোনাথান ।। ষ্ট্যান্‌লি ।।
।। রিচার্ড ।। মিষ্টার হেল ।। মিষ্টার ব্যারোজ ।।
।। মিষ্টার বীরচাঁদ গান্ধী ।। মিষ্টার চক্রবর্তি ।।
।। ডক্টর মোমেরি ।। কতিপয় শ্রোতা ।।

বিবেকানন্দ

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[কলকাতায় বিশ্বনাথ দত্ত'র বাড়ির একতলার একখানি ঘর। ঘরের সামনে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ঘরের পিছনের দেওয়ালের মাঝখানে একটি দরজা। সেই দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে যাওয়া যায়। দরজার দুদিকে দুটি তাক। এই তাকে থালা বাটি এবং অন্যান্য রকমারি জিনিস সাজানো। ঘরের সামনের দিকে রাস্তার ধারের দেওয়ালে (এটি অদৃশ্য কাল্পনিক দেওয়াল—ইংরেজিতে যাকে বলে ফোর্থ ওয়াল) একটি বড় জানালা। (পিচবোর্ড বা কাঠের তৈরি একটি প্রকৃত জানালা বসিয়ে নিতে হবে।) এই জানালার ধারে দাঁড়ালে রাস্তার লোকজনের চলাফেরা চোখে পড়ে। সময় সকাল সাড়ে পাঁচটা। ভৃত্য ভোলা 'বিলে' অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিবেকানন্দের একটা হাত চেপে ধ'রে ঘরে ঢোকে। বিবেকানন্দের বয়স তখন আট বছর।]

বিলে ॥ ভাল হবে না বলছি ভোলা। শিগগির আমার হাত ছেড়ে দে। (ছাড়াবার চেষ্টা করে) ছাড়—ছাড়—

ভোলা ॥ (বিলের হাত ছেড়ে দেয়) এই নাও ছাড়লুম—হল ত ?

বিলে ॥ তুই আমায় এ ঘরে নিয়ে এলি কেন ?

ভোলা ॥ এখানে নিরিবিলিতে চোখ বুঁজে বসে একটু শিবের ধ্যান করনা গো।

বিলে ॥ তোর কথায় ?

ভোলা ॥ এই দেখ, বিলে দাদাবাবু কি বলে ! আমার কথায় কেন গো ? শিবের ধ্যান করতে তোমার ত কত ভাল লাগে !

বিলে ॥ লাগেই ত।

ভোলা ॥ তবে ?

বিলে ॥ সে আমার যখন খুশি করব, আর যেখানে খুশি বসে করব। তুই আমায় এই সাত সকালে এখানে জোর করে ধরে নিয়ে এলি কেন বল্ ?

ভোলা ॥ তুমি যে বড্ড দুষ্টুমি করছগো বাবু। তাই ত মা বললে—

বিলে ॥ আমাকে এই ঘরে আটকে রাখতে—

ভোলা ॥ না, মানে, ঠিক আটকে রাখতে নয়—

বিলে ॥ আমি কি দুষ্টুমি করেছি ?

ভোলা ॥ করেছ গো বাবু—

বিলে ॥ বল্ কি দুষ্টুমি করেছি ?

ভোলা ॥ সক্কালবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি হুঁকো টানছিলে কেন ?

বিলে ॥ হুঁকো টানাটা দুষ্টুমি হল ?

ভোলা ॥ নয় ? একি বলছ গো !

বিলে ॥ ঠিক বলছি। আমি তামাক খাবার জন্যে হুঁকো টানিনি।

ভোলা ॥ তবে কি জন্যে টেনেছ ?

বিলে ॥ পরীক্ষা করে দেখছিলাম।

ভোলা ॥ পরীক্ষা ! কিসের ?

বিলে ॥ তোরা যে বলিস্ এক জাতের লোকের হুঁকো আর এক

জাতের লোক টানলে তার জাত যায়। তাই বাবার ঘরে পাঁচ সাতটা হুঁকো রেখেছিস্।

ঠিকই ত। জাত ত যায়ই।

কচু যায়। আমি ত মুসলমানের হুঁকো টেনেছি। কই, আমার জাত গেছে?

ভোলা ॥ অ্যাঁ! একি বলছগো দাদাবাবু! তুমি মুসলমানের হুঁকো টানলে?

বিলে ॥ বেশ করেছি টেনেছি। আমি ওসব জাতটাত মানি না।

ভোলা ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ —এ তুমি কি করেছ বল ত! সাধে কি মা আমায় বললে—

বিলে ॥ কি বলেছে তোকে?

ভোলা ॥ না, এমন কিছু নয়—বললে, ভোলা বিলেবাবুকে ওঘরে নিয়ে গিয়ে একটু ধ্যানে বসিয়ে রাখ ত। তা করনা গো বাবু, চোখ বুঁজে বসে একটু শিবের ধ্যান করনা—এসো—এসো—

[বিলেকে হাত ধরে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দেয়। বিলে চোখ বুঁজে স্থির হয়ে বসে। ভোলা এবার পা টিপে টিপে পিছনের দরজার দিকে যায়। বিলে টের পায়, কিন্তু বাধা দেয় না।]

বিলে ॥ ভোলা বেটা ভাবছে আমি কিছুই টের পাচ্ছি না। ও এবার বাইরে থেকে দরজার শেকল তুলে দেবে। আমায় ঘরে আটকে রাখ্‌বে। ঠিক আছে, রাখুক্।

[ভোলা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজার শেকল তুলে দেয়। বিলে উঠে দরজার কাছে যায়। দুমদুম্ করে দরজায় কিল মারে।]

বিলে ॥ এই ভোলা—ভোলা—দরজা খুলবি কিনা বল্।

ভোলা ॥ (নেপথ্যে) বসে বসে শিবের ধ্যান কর গো বাবু—একঘণ্টা বাদে খুলে দেব—মা তোমায় আটকে রাখতে বলেছে।

বিলে ॥ আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি, আমার সংগে চালাকি !

[বিলে ঘরের এদিক ওদিক ঘোরে। হাত মুখের ভংগি করে কি যেন বলে বিড় বিড় করে, বোঝা যায় না। মনে হয় একটা মতলব আঁটছে। তারপর ঘরের মাঝখানে দর্শকদের দিকে মুখ করে সে ধ্যানে বসে। কি এক পরমানন্দে তার ধ্যানমগ্ন দেহটি যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এমন সময় এক বাউল গান গাইতে গাইতে ঘরের সামনের রাস্তায় প্রবেশ করে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সে ধ্যানরত বিলেকে দেখে আর গান গেয়ে যায়।]

ঃ বাউলের গান ঃ

হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে না।
মুখে বলি হরি হরি
মনে ত দাগ পড়ে না,
তাই নয়ন ঝরে না।
চোখে যদি জল ঝরিত
হরি এসে দেখা দিত,
শুকনো প্রাণের মাঝখানে সে
আসন করে না।

[গান শেষ হয়]

বাউল ॥ জয় হোক বাবাঠাকুর।

বিলে ॥ (চোখ না খুলে) কে ?

বাউল ॥ আমি এক বাউল ভিখিরী গো। কিছু ভিক্ষে চাই। (বিলে উঠে আসে) তুমি চোখ বুঁজে কি করছিলে গো ?

বিলে ॥ ধ্যান করছিলুম।

বাউল ॥ কার গো ?

বিলে ॥ ভগবানের।

বাউল ॥ বল কিগো! তোমার ত ভারি মিষ্টি কথা!

বিলে ॥ তুমিত গান গেয়ে আমার ধ্যান ভেঙে দিলে!

বাউল ॥ তা ভাঙলেই বা। ভগবানের ধ্যান—ও যখন করবে তখনই হবে। তার জন্য ভাবনা কি।

বিলে ॥ কিন্তু ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি না যে!

বাউল ॥ তুমি বুঝি তাকে দেখতে চাও ?

বিলে ॥ নিশ্চয়ই। না দেখতে পেলে আর হল কি ?

বাউল ॥ চাও যখন, তখন নিশ্চয় পাবে।

বিলে ॥ পাব ? কিন্তু কবে ?

বাউল ॥ তা, দেখতে তুমি ত পাচ্ছই গো।

বিলে ॥ কই পাচ্ছি ? তাকে দেখব বলে ত ধ্যান করি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না।

বাউল ॥ ভগবানকে তুমি রাতদিন খুঁজছো আর তাকে দেখতে পাচ্ছো না ? ঐ খোঁজাটাই যে ভগবান গো। চোখ দিয়ে না দেখলেও তুমি তোমার প্রাণ দিয়ে তাকে দেখছ—হ্যাঁ সর্বক্ষণ দেখছ।

বিলে ॥ কি যে বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাউল ॥ ঠিক কথাই বলছি বাবা।

বিলে ॥ আচ্ছা, তুমি ভগবানকে দেখেছ ?

বাউল ॥ আমিও তোমার মত তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি গো—সারা জীবন ধরে।

বিলে ॥ তাকে দেখেছ ?

বাউল ॥ পলকে দেখি আবার পলকে হারাই। তেমন করে দেখতে আর পেলুম কই গো। এ জীবনে বোধ হয় তেমন করে দেখা আর হবে না !

বিলে ॥ তার মানে তুমি কিছুই দেখনি।

বাউল ॥ হা হা হা। তা যা বলেছ বাবা। (গান ধরিল)

পলকে দেখি আর পলকে হারাই
দেখা না-দেখার মাঝে নিয়েছ যে ঠাঁই,
নিঠুর হরি আজও তোমার লীলা বুঝি নাই।

[গান শেষ হয়]

বিলে ॥ তোমার গানগুলো কিন্তু ভারি মিষ্টি। তুমি কোথায় থাক ?

বাউল ॥ ঐ দক্ষিণ দিকে শহরটা যেখানে মাঠে গিয়ে মিশেছে—ঐখানে।

বিলে ॥ তোমার বাড়িটা কেমন ?

বাউল ॥ বাড়ি আবার কি গো ! একটা কুঁড়ে ঘর।

বিলে ॥ কে আছে তোমার ?

বাউল ॥ সংসারে কার আবার কে থাকে! সবাই এখানে একা। আমিও একা।

বিলে ॥ তোমার বাপ মা কেউ নেই?

বাউল ॥ কেউ না।

বিলে ॥ ভাই বোন?

বাউল ॥ তাও না।

বিলে ॥ (একটু চিন্তা করে) আচ্ছা, তোমার বউ নেই?

বাউল ॥ দূর—আমি বিয়েই করিনি।

বিলে ॥ (উৎসাহিত হয়ে) খুব ভাল করেছ। বিয়ে বড্ড খারাপ। কক্ষনো বিয়ে করতে নেই। আমাদের কচুয়ানটাও বিয়ে করে নি। জানলে, আমিও কোনদিন বিয়ে করব না।

বাউল ॥ কেন বল ত? বিয়ের ওপর তোমার অত রাগ কেন?

বিলে ॥ হবে না? দেখ না, রামের কি কষ্ট। সীতাকে বিয়ে করেছিল বলেইত এত দুর্দশা হল। আমি আগে রাম সীতার মূর্তি পুজো করতুম, এখন আর করি না।

বাউল ॥ সে কি গো!

বিলে ॥ হ্যাঁ। ও রাম সীতায় আমার পোষাবে না।

বাউল ॥ এখন তবে কার পুজো কর?

বিলে ॥ এখন আমি শিবের পুজো করি। শিবকে আমার খুব ভাল লাগে। কেমন একা একা থাকে। সাজ নেই, পোষাক নেই। গায়ে ছাই মাখা। শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। ভয় কাকে বলে জানে না। মস্ত সন্নিসি। শিবের মত

কেউ হয় না। জানলে, বড় হয়ে আমিও শিবের মত হব। সন্নিসি হব।

বাউল ॥ তাই না কি গো?

বিলে ॥ হ্যাঁ।

বাউল ॥ ভয় করবে না তোমার?

বিলে ॥ ভয় কেন করবে? শিবের কি ভয় করে? আমার ঠাকুর্দা দুর্গাচরণ দত্ত সন্নিসি হয়ে গেছে। তার কি ভয় করেছে? ভয় একটা মিথ্যে জিনিস। এই দেখ না, আমাদের ও পাড়ার মাঠে একটা তেঁতুল গাছ আছে। রোজ আমি সেই গাছটায় উঠি। সেদিন এক বুড়ো আমায় বললে, "ও গাছে উঠো না, বেহ্মদত্যি থাকে।" আমি বললুম, "রোজ ত উঠি। কই, বেহ্মদত্যির দেখা পাইনা ত।" বুড়ো বললে, "রাত্তির বেলা বেহ্মদত্যিটা আসে কিনা।" বুড়োর কথা শুনে বেহ্মদত্যিটাকে দেখতে আমার ইচ্ছে হল। একদিন করলুম কি, রাত দশটার সময় কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলুম।

বাউল ॥ বল কি গো!

বিলে ॥ কি করব। বেহ্মদত্যিটাকে যে আমার দেখতেই হবে। রাত বারোটা অবধি আমি সেই গাছে উঠে বসে রইলুম। মনে মনে বেহ্মদত্যিটাকে কত ডাকলুম। কিন্তু সব ভোঁ ভাঁ—কেউ এল না। এখন বুঝেছি—ওসব গাঁজাখুরি কথা। তারপর বাড়ি ফিরে দেখি হৈ চৈ

পড়ে গেছে। সবাই আমাকে খুঁজছে। উঃ, মা যা মেরেছিল সেদিন !

বাউল ॥ (স্বগতঃ) এ পাড়ায় ভিক্ষে করতে এসে আজ কার দেখা পেলুম ভগবান ! এই কি আমার সেই প্রাণের ঠাকুর ! ইচ্ছে হচ্ছে এর পা দুখানি একবার বুকে রাখি—হে প্রভু ! (বাউলের চোখে জল ঝরে)

বিলে ॥ কি বলছ গো তুমি বিড় বিড় করে? তুমি কাঁদছ কেন গো ?

বাউল ॥ কে বললে কাঁদছি—দূর—দূর—(জোর করে হাসবার চেষ্টা করে) আমি ত হাসছি—হ্যাঁ, হাসছি—

বিলে ॥ যাঃ—মিথ্যে কথা—আমি দেখলুম তোমার চোখে জল—কেন বল ত ?

বাউল ॥ আমার চোখে যে নারায়ণ এসেছিল গো—তাই ত জল দেখেছ।

বিলে ॥ তুমি বুঝি নারায়ণের পুজো কর ?

বাউল ॥ হাঁ।

বিলে ॥ তাকে কেমন দেখতে ?

বাউল ॥ তাকে দেখতে ? (একটু ইতস্ততঃ করে) এই অনেকটা তোমার মত।

বিলে ॥ ধ্যেৎ—কি যে বল।

বাউল ॥ হ্যাঁ গো, সত্যি বলছি। অনেকটা কেন, ঠিক তোমার মত। আহা, কি সে রূপ ! নবদূর্বাদলশ্যামকান্তি পদ্মপলাশ-লোচন—

বিলে ॥ কি বলছ তুমি ?

বাউল ॥ না, না, কিছু না। আচ্ছা বাবাঠাকুর, আমার একটা কথা রাখবে ?

বিলে ॥ কি কথা ?

বাউল ॥ এই—এই টুলটায় একবার তুমি দাঁড়াও না গো।

বিলে ॥ কেন, দাঁড়াব কেন ?

বাউল ॥ এমনি লক্ষীটি—একবার দাঁড়াও।

বিলে ॥ দাঁড়িয়ে কি হবে বল না ?

বাউল ॥ কিচ্ছু হবে না। এমনি দাঁড়াও। আমি মিনতি করছি বাবা।

বিলে ॥ আচ্ছা বেশ। অত করে যখন বলছ—দাঁড়াচ্ছি। (বিলে টুলের উপর দাঁড়ায়। জানালা দিয়ে দুহাত গলিয়ে বাউল সহসা বিলের পা দুটো চেপে ধরে আর গভীর আবেগে মাথা নত করে বার বার প্রণাম জানায়। বিলে ঘাবড়ে যায়।) ওকি ! ওকি ! তুমি আমার পা ছুঁচ্ছো কেন ? আমায় নমস্কার করছ কেন ? ওকি।

বাউল ॥ (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) না—না—কিছু না—এমনি—এমনি—

[প্রস্থানোদ্যত]

বিলে ॥ তুমি চলে যাচ্ছ কেন ?

বাউল ॥ আবার আসব গো আবার আসব। তোমার কাছে কি না এসে পারি !

[প্রস্থান]

বিলে ॥ ও বাউল ভাই, বাউল ভাই, ভিক্ষে নেবে না ? শোন—

শোন—(বাউল আর ফিরে আসে না) অমন করে চলে গেল কেন? আমার পা ছুঁয়ে নমস্কাব করল কেন? হঠাৎ কি যে হল! আহা, বড় ভাল লোক ঐ বাউল। কি সুন্দর গান গায়! (জানালা ছেড়ে বিলে ঘরের মাঝখানে আসে। এদিক ওদিক কয়েকবার ঘোরাফেরা করে। মনে মনে কি যেন বলে বিড় বিড় করে। তারপর বন্ধ দরজায় ফের ধাক্ক মারে, "ওমা, মা, ভোলা, ওরে ভোলা, দরজা খুলবি কিন বল্।" অন্দরমহল থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না বিলে দরজার কাছ থেকে ফিরে আসে। এমন সময় অদূরে রাস্তায় শোনা যায়, "জয় শিবশম্ভু, জয় শিবশম্ভু।' বিলে তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।)

বিলে ॥ ও ভাই শিবশম্ভু—শোন—শোন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো—

[ত্রিশূলধারী গায়ে ভস্মমাখা এক সাধুর প্রবেশ। তা কাঁধে একটা ঝোলা।]

সাধু ॥ হর হর ব্যোম ব্যোম মহাদেও। জয় হোক বাবা, জ হোক। কি খোকা, আমায় ডাকছ?

বিলে ॥ হ্যাঁ, ডাকছি ত।

সাধু ॥ তুমি এই ঘরে একা একা কি করছ?

বিলে ॥ দেখনা, ভোলা আমাকে আটকে রেখে গেছে।

সাধু ॥ ভোলা কে?

বিলে ॥ আমাদের চাকর।

সাধু ॥ নিশ্চয় তুমি খুব দুষ্টুমি করেছিলে। যাক্, সাধুকে কিছু ভিক্ষে টিক্ষে দাও।

বিলে ॥ দোব, দোব। তুমি বুঝি সাধু ?

সাধু ॥ নিশ্চয়! দেখছ না, গায়ে ছাই, হাতে ত্রিশূল।

বিলে ॥ ছাই আর ত্রিশূল থাকলেই বুঝি সাধু হয় ?

সাধু ॥ হ্যাঁ, মানে—হবে না ? তবে সাধন ভজন পুজো আচ্চা—তাও করতে হয়।

বিলে ॥ তুমি কার পুজো কর ?

সাধু ॥ আমি শিবের পুজো করি।

বিলে ॥ শিবের! বাঃ চমৎকার! শিবকে আমার খুব ভাল লাগে।

সাধু ॥ তাই নাকি ?

বিলে ॥ হ্যাঁ। আমিও শিবের পুজো করি কিনা। আচ্ছা, তুমি ভগবানকে—মানে শিবকে দেখেছ ?

সাধু ॥ তা—তা—দেখেছি বৈকি।

বিলে ॥ সত্যি! দেখেছ!

সাধু ॥ নিশ্চয়।

বিলে ॥ তোমার সামনে এসে দেখা দিয়েছে ?

সাধু ॥ একেবারে সামনে—আমার হাতের কাছে।

বিলে ॥ তোমার সঙ্গে কথা বলেছে ?

সাধু ॥ হ্যাঁ। কত কথা বললে।

বিলে ॥ কি কথা ?

সাধু ॥ ঐ ত—কৈলাসের কথা—নন্দী ভৃঙ্গীর কথা—

বিলে ॥ আমাকে দেখিয়ে দিতে পার ? আমি কত ধ্যান করি। কিন্তু শিবঠাকুর কিছুতেই আমায় দেখা দিচ্ছে না। দেবে আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে ?

সাধু ॥ তা দিলেই হয়। ও আর এমন শক্ত কি।

বিলে ॥ বাঃ। তাহলে খুব ভাল হবে। আচ্ছা, তুমি কৈলাসে যাওনি ?

সাধু ॥ শিব ত প্রায়ই যেতে বলে। এবার ভাবছি একদিন যাব।

বিলে ॥ সত্যি! শিব তোমায় বলেছে ? আমাকেও তাহলে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। আমার কি যে ইচ্ছে করে কৈলাসে যেতে!

সাধু ॥ বেশ, আমার সংগে যেও।

বিলে ॥ কিসে করে যাবে বল ত ?

সাধু ॥ কিসে ? মানে, তোমার কিসে যেতে ইচ্ছে করে বল ত ?

বিলে ॥ ষাঁড়ের পিঠে চেপে।

সাধু ॥ তাই যাওয়া যাবে। শিবকে বললেই আমাদের জন্যে দুটো স্বর্গের ষাঁড় পাঠিয়ে দেবে। তারপর সে দুটোর পিঠে চেপে সোঁ করে কৈলাসে চলে যাব।

বিলে ॥ আমার জন্যে শিবঠাকুর কি ষাঁড় পাঠাবে ?

সাধু ॥ পাঠাবে না মানে ? শিবঠাকুর ত আমার কথায় ওঠে বসে

বিলে ॥ তাহলে কবে যাবে ?

সাধু ॥ চলো না—দু একদিনের মধ্যেই যাওয়া যাক্।

বিলে ॥ বেশ, তাই হবে। কি মজা! কদিন থাকবে ?

সাধু ॥ তোমার যে কদিন খুশি। কিন্তু, তোমার বাড়িতে আবার বকবে না ত ?

বিলে ॥ হুঁ, বকলেই হল। শিবের কাছে যাব আবার বকবে কি ?

সাধু ॥ (এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) কিন্তু যাবে যে, যাতায়াতের খরচপত্তর লাগবে ত !

বিলে ॥ তা লাগুক না।

সাধু ॥ কোথায় পাবে ?

বিলে ॥ কেন, বাবার কাছ থেকে চেয়ে নোব।

সাধু ॥ খবরদার ! খবরদার ! বাপমায়ের কাছে ওসব কথা বলতে আছে ! ওরা তাহলে যাওয়াই বন্ধ করে দেবে।

বিলে ॥ তাই নাকি ?

সাধু ॥ হ্যাঁ।

বিলে ॥ তাহলে কি হবে ?

সাধু ॥ (চাপা গলায়) তোমার কাছে টাকা পয়সা নেই ?

বিলে ॥ আমি কোথায় পাব ! আমি ত ছোট।

সাধু ॥ (কৃত্রিম হতাশার ভংগিতে) তাহলে তোমার আর কৈলাসে যাওয়া হল না। যাক্, আমাকে একাই যেতে হবে—

[আড় চোখে বিলের দিকে তাকিয়ে সাধু প্রস্থানের উদ্যোগ করে।]

বিলে ॥ শোন, শোন, ও সন্নিসি, যেওনা—

[সাধু ফেরে]

সাধু ॥ কি, বল।

টাকার বদলে যদি কতগুলো জিনিস দিই তোমায় ?

(সাগ্রহে) কি জিনিস দেবে ?

এই ধরনা, এই ঘরে যা আছে (তাকের দু দিকে তাকায়) থালা, বাটি—

সাধু ॥ টাকা পেলেই সুবিধে হত। তবে যাক্, বলছ যখন তুমি— থালাবাটিগুলোই দাও।

বিলে ॥ একটু দাঁড়াও, আমি জিনিসগুলো নাবাই। (বাঁ দিকের তাকে অনেক থালার মধ্যে একখানা রূপোর থালা ছিল। বিলে সেটা টেনে বার করে।) একটা রূপোর থালা আছে। এটা নেবে ?

সাধু ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐটাই আনো।

[বিলে রূপোর থালাটা সাধুর হাতে দেন। সাধু এদিক ওদিক তাকিয়ে থালাটা ঝোলায় রাখে।]

আর সব থালাবাটিগুলো এবার নিয়ে এস।

[বিলে দু তাকের সব কাঁসার থালাবাটি এক এক করে নামিয়ে সাধুর হাতে দেয়। সাধু সেগুলো ঝোলায় ভরে রাখে। লোভে তার চোখ দুটো চকচক করতে থাকে।]

আরো কিছু ভাল জিনিস আছে কিনা দেখ।

বিলে ॥ ঐ তাকে একটা রূপোর বাটি আছে, নেবে ?

সাধু ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নোব বৈকি ! তুমি লক্ষ্মী ছেলে।

[বিলে রূপোর বাটিটা সাধুর হাতে এনে দেয়। সাধু বাটিটা ঝোলায় রাখে।]

আচ্ছা, কাপড় টাপড় কিছু নেই ?

বিলে ॥ ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ ! বাবা কাল একখানা খুব দামী ধুতি এনেছে।

সাধু ॥ কই ? কই ?

বিলে ॥ এই ঘরেই ত মা রেখেছিল।

সাধু ॥ দেখত—দেখত।

বিলে ॥ দাঁড়াও দেখছি। (এ তাক ও তাক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ আবিষ্কার করে ধুতিখানা) এই ত ! পেযে গেছি !

সাধু ॥ নিয়ে এস। শিগগির।

বিলে ॥ (কাপড় খানা নিয়ে আসে) এই নাও।

[সাধু পোঁটলা বাঁধে। তারপর সে চলে যাবার উপক্রম করে।]

ও সন্নিসি, তুমি চলে যাচ্ছ কেন ?

সাধু ॥ বাঃ, কৈলাসে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে না ; আমি এখন যাই-- [প্রস্থান]

বিলে ॥ কবে যাবে বলে গেলে না ত—ও সন্নিসি—সন্নিসি—

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা ॥ কিগো বাবু ? কাকে ডাকছ ?

বিলে ॥ (সাগ্রহে) ভোলা—ভোলা—আমি কৈলাসে যাব—শিব-ঠাকুরের দেখা পাব। ভাগ্যিস্ তুই আমায় এই ঘরে আটকে রেখেছিলি !

ভোলা ॥ এসব কি বলছগো বাবু !

বিলে ॥ সত্যি বলছিরে। সন্নিসি আমায় সংগে করে নিয়ে যাবে বলেছে।

ভোলা ॥ (কিছু ভয় পেয়ে) সন্নিসি ! সন্নিসি আবার এলো কোত্থেকে ?

বিলে ॥ এই ত একটু আগে এসেছিল। তুই আসতেই চলে গেল। তার সংগে রোজ শিবঠাকুরের দেখা হয়। শিবঠাকুর দুটো ষাড় পাঠিয়ে দেবে। তাতে চেপে সে আর আমি কৈলাসে যাব। পথে খরচের দরকার। তাই আমি থালা বাটি—

ভোলা ॥ অ্যাঁ ! (বিলে চুপ করে থাকে। ভোলা তাক দুটোর দিকে তাকায়। সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে।) থালা বাটিগুলো সন্নিসিকে দিয়ে দিয়েছ ? সর্বনাশ ! রূপোর থালা বাটি দুটো কই ? কি গো বাবু ?

বিলে ॥ (নিম্ন স্বরে) সন্নিসিকে দিয়ে দিয়েছি।

ভোলা ॥ সব থালাবাটিগুলো দিয়ে দিলে ? আর কি দিয়েছ ? (বিলে নিরুত্তর) কি গো, কথা বলছ না কেন ?

বিলে ॥ বাবার নতুন কাপড়খানা দিয়েছি !

ভোলা ॥ সর্বনাশ করেছ গো ! ও কর্তাবাবু, দেখে যাও তোমার খোকার কাণ্ড

(বিশ্বনাথ দত্তর প্রবেশ)

বিশ্বনাথ ॥ কিরে ভোলা, অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন ?

ভোলা ॥ দেখ কর্তাবাবু, রূপোর থালাবাটি, কাঁসার থালাবাটি, তোমার নতুন ধুতিখানা—এই সব জিনিস খোকাবাবু একটা জোচ্চোর সাধুকে দিয়ে দিয়েছে

বিশ্বনাথ ॥ কারণ ?

ভোলা ॥ সাধু ওকে ষাঁড়ের পিঠে চাপিয়ে কৈলাসে নিয়ে যাবে—
শিবের সংগে দেখা করিয়ে দেবে—

বিশ্বনাথ ॥ তা সৎ উদ্দেশ্যে দিয়েছে, ক্ষতি কি।

ভোলা ॥ কিন্তু সাধুটা যে জোচ্চোর—

বিশ্বনাথ ॥ তাতে সাধুটারই লোকসান, কি বল্ বিলে ?

বিলে ॥ না বাবা, সাধু ঠিক আসবে, তুমি দেখো—

বিশ্বনাথ ॥ নিশ্চয়। Faith—faith can do miracle. বিশ্বাসে কি না হয়।

ভোলা ॥ তুমি কি বলছ গো কর্তাবাবু! বরং একটা পুলিশে খবর দাও।

বিশ্বনাথ ॥ দেখ্ ভোলা, Forbearing one another, and forgiving one another, if any man has a quarrel against any : even as Christ forgave you, so also do ye। ক্রাইস্ট যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছিলেন, তোমরাও তেমনি সকলকে ক্ষমা করো।

ভোলা ॥ হা ভগবান! জিনিসগুলো এমনিভাবে খোয়া যাবে!

বিশ্বনাথ ॥ Poor fellow! বাইবেল বুঝলে না!

[ত্রিশূলধারী সাধুর প্রবেশ]

সাধু ॥ (শান্ত নম্র কণ্ঠে) বাবা!

বিশ্বনাথ ॥ (চমকে উঠে) কে ?

বিলে ॥ সন্নিসি তুমি এসেছ ? দেখেছ বাবা দেখেছ, ভোলা বলছিল সান্নিসি আসবে না। ভোলাটা কিচ্ছু জানে না। ও সন্নিসি, কৈলাসে যাবার দিন ঠিক করে ফেল।

সাধু ॥ আমায় ক্ষমা করুন বাবা, আমায় ক্ষমা করুন (ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে জানালায় মাথা নত করে।) আমি পাপী—মহাপাপী। (তারপর মাথা তুলে ঝোলা থেকে থালা বাটি আর নতুন কাপড় বের করে জানালা দিয়ে ঘরে রাখে।) এবার আমায় পুলিশে দিন বাবা।

বিশ্বনাথ ॥ তুমি ত বড্ড বোকা দেখছি হে। জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিতে এলে কেন ?

সাধু ॥ না এসে পারলুম না বাবা। একটু দূরে গিয়ে কেবলই মনে হতে লাগল—আজ আমি যেন আমার প্রাণের ঠাকুরকে ঠকিয়েছি। আপনি আমায় পুলিশে দিন বাবা, তবে আমি শান্তি পাব। (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।)

বিশ্বনাথ ॥ দেখছিস্‌ত ভোলা কি ব্যাপার ! For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. স্বর্গ থেকে ঈশ্বর নেমে আসবেন রে, ঈশ্বর নেমে আসবেন।

[ভোলা পরম স্নেহে বিলেকে কাছে টেনে নেয় আর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।]

ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দশ বৎসর পর। পূর্বোক্ত ঘর। আলমারির জিনিসপত্র এবং ঘরের আসবাবের পরিবর্তন হয়ে গেছে। সময় বিকেল।]

ভোলা ॥ বাবু!

বিশ্বনাথ ॥ কি রে ভোলা।

ভোলা ॥ দাদাবাবুর দিকে আপনি একটুও নজর দিচ্ছেন না।

বিশ্বনাথ ॥ এ কথা বলছিস্ কেন রে?

ভোলা ॥ না, এই— বলছিলুম—

বিশ্বনাথ ॥ তা তোর দাদাবাবু কি কচি খোকা নাকি যে তার দিকে নজর দিতে হবে?

ভোলা ॥ প্রায়ই রাত্তিরে বাড়ি আসে না যে।

বিশ্বনাথ ॥ বাড়ি আসে না! কোথায় যায়?

ভোলা ॥ না, যায় না কোথাও—ঐ দিদিমার বাড়ির পড়ার ঘরেই থাকে।

বিশ্বনাথ ॥ তাই বল্। এমন ভাবে বললি কথাটা!

ভোলা ॥ নিজেদের বাড়ি বসে পড়লেই ত পারে।

বিশ্বনাথ ॥ কি যে বলিস তুই! আমাদের বাড়িতে কি শান্তিতে পড়ার যো আছে? রাতদিন্ন চেঁচামেচি। তার চেয়ে ও দিদিমার বাড়ি গিয়ে পড়ছে—দিদিমা ওর জন্যে একটা আলাদা ঘর রেখে দিয়েছে—কত সুবিধে বল্ দেখি।

ভোলা ॥ তা, রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে এলেই ত পারে। সারা রাত জেগে পড়া কি !

বিশ্বনাথ ॥ পড়বে না ? ওর এফ. এ. পরীক্ষা এসে গেছে যে।

ভোলা ॥ কিন্তু রাত জেগে দাদাবাবু পড়ে না।

বিশ্বনাথ ॥ পড়ে না ! তবে কি করে ?

ভোলা ॥ ধ্যান করে, ধ্যান--

বিশ্বনাথ ॥ ও ধ্যান করে, সে ত ভাল জিনিস।

ভোলা ॥ কি যে বলেন বাবু। এই বয়সে ওসব দিকে মতিগতি যাওয়া কি ভাল ? মা কত দুঃখ করছিলেন। দাদাবাবু যদি আপনার পিতাঠাকুরের মত হয়ে যায় ?

বিশ্বনাথ ॥ হলে আর তুই ঠেকাবি কি দিয়ে।

ভোলা ॥ দাদাবাবুর একটা বিয়ে দিয়ে দিন বাবু।

বিশ্বনাথ ॥ বেটা মুখ্যু। আমার বাবা কি বিয়ে করেনি ? তবে সন্ন্যাসী হয়ে গেল কেন ? তাছাড়া গৌতম বুদ্ধ, শ্রীগৌরাংগ—এরাও ত সব বিয়ে করেছিলেন, না কি ? (ভোলা নিরুত্তর) কি রে একেবারে বোবা হয়ে গেলি যে।

ভোলা ॥ আপনার সংগে কি আমরা কথায় পারি ?

বিশ্বনাথ ॥ আচ্ছা ভোলা, তোর দাদাবাবু কি বিয়ে করবে ?

ভোলা ॥ মা ত বলে, কিন্তু দাদাবাবু রাজি হয় না।

বিশ্বনাথ ॥ তবে যে আমায় বিয়ে দিতে বল্‌ছিস্ ?

ভোলা ॥ আপনি বাপ, আপনার কথা শুনবে না ?

বিশ্বনাথ ॥ জোর করে আমি কিছু করবো না।

ভোলা ॥ কি জানি বাবু, আপনাদের কি ইচ্ছে।

বিশ্বনাথ ॥ নরেনের রামকাকাকে দিয়ে ওর মত আদায় কর না। রামকাকাব কথা ও শোনে। যাক্, আমার মক্কেলরা বোধ হয় আসতে সুরু করেছে, আমি যাই। [প্রস্থান]

ভোলা ॥ যেমনি বেটা তার তেমনি বাপ। সব একগুঁয়ে। বলে কিনা (বিশ্বনাথের ভংগি অনুকরণ করে) "জোর করে আমি কিছু করবো না।" আরে বাবা ছেলের বিয়ে কে আবার কবে জোর করে দিয়েছে। ওরা মুখে অমন বলে 'করবো না, করবো না'। দিন ঠিক করে লাগিয়ে দাও, দেখবে সুড সুড করে পি ডিতে গিয়ে বসেছে। এই ত —আমাব বাপ যখন আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন আমিও মুখে বলেছিলাম, "নেহি করেংগে"। কিন্তু ওটা কি আর আমার মনের কথা ?

। রাম কাকার প্রবেশ ।

রাম ॥ কিরে ভোলা, খালি ঘবে কার সংগে কথা বলছিস্ ?

ভোলা ॥ এই যে কাকাবাবু, তুমি এসে গেছ।

রাম ॥ কেন রে ? আমায খুঁজছিলি নাকি ?

ভোলা ॥ খুঁজছি—মানে—না—এই কর্তাবাবুর সঙ্গে তোমার কথাই হচ্ছিল।

রাম ॥ আমার কথা ? দাদার সংগে ?

ভোলা ॥ হ্যাঁ গো।

রাম ॥ কি কথা রে ?

ভোলা ॥ এই বলছিল, তুমি যদি নরেন দাদাবাবুকে বিয়ের জন্য মত করাতে পার—

রাম ॥ ও বাবা, এখানেও ঐ এক কথা। বৌদিত রাতদিন আমার মাথা খাচ্ছে, এবার তোরাও সুরু করলি ?

ভোলা ॥ তা দাদাবাবু বড় হয়েছে, বে দিতে হবে না ?

রাম ॥ কেন, বিয়ে না দিলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হবে ? আর বিয়ে দিলেই বা নরেনের কটা হাত পা গজাবে ? ছেলেটাকে তোরা নষ্ট করে দিতে চাইছিস্ কেন বল্ ত ?

ভোলা ॥ সেকি গো কাকাবাবু, বিয়ে করলে দাদাবাবু নষ্ট হয়ে যাবে কেন ? এই যে আমরা সবাই বিয়ে করেছি, আমরা কি নষ্ট হয়ে গেছি ?

রাম ॥ গুবরে পোকারা গোবরেই ভাল থাকে। কিন্তু যারা গুবরে পোকা নয় ?

ভোলা ॥ যা বাবা, কোন কথায় যে কোন্ উত্তর দাও, তা আমি বুঝতেই পারি না।

রাম ॥ যাক, তোর আর বুঝে কাজ নেই। শোন ভোলা, আমি একটু বেরুচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্‌বো। কেউ এলে বস্‌তে বলিস্।

ভোলা ॥ আচ্ছা।

[রাম কাকার প্রস্থান]

নাঃ, দাদাবাবুটাকে এরা আইবুড়ো করে রাখবে ঠিক করেছে। যাক্, বরাতে যা আছে তাই হবে।

[নরেনের প্রবেশ । সে কলেজ থেকে ফিরল । [illegible] ।]

নরেন ॥ ওরে ভোলা, খিদেয় মরে গেলুম । শিগগির খেতে দে ।

ভোলা ॥ জিরো-ও, জামা কাপড় ছাড়, তবে ত ।

নরেন ॥ জিরোব কেন রে ? কি এমন খাটুনির কাজ করে এলুম ? ওস্তাদের দেওয়া নতুন হিন্দী ভজনটা এক্ষুণি ঠিক করতে হবে । তানপুরাটা নাবা ত ।

[ভোলা তানপুরা নামিয়ে নরেনের হাতে দেয় ।]

যা এবার খাবার নিয়ে আয় ।

[ভোলার প্রস্থান । নরেন তানপুরার তারগুলো ঠিক করে [illegible] বসে । এমন সময় একজন বাউল জানালার বাইরে [illegible] । তানপুরা বাজা বন্ধ রেখে নরেন গানটা শুনতে থাকে ।]

ঃ বাউলের গান ঃ

ও তুমি ভেক লইয়ো না রে নিমাই
অলপ বয়সে—

যখন জন্মেছিলিরে নিমাই নিমতরু তলে
হইয়া যদি মরিতে রে নিমাই না লইতাম কোলে
রে নিমাই ।

কোথায় থিকা আইলারে গুরু বসতে দিলাম ঠাঁই
প্রভাতে উঠিয়া দেখি নিমাই ঘরে নাই
রে নিমাই ।

আগে যদি জানতাম রে তর মনে ছিল ইহা
না দেওয়াইতাম ফুল বাগিচা না দেওয়াইতাম বিয়া
রে নিমাই।

ভেক না লইয়ো রে নিমাই সন্ন্যাসী না হইয়ো
আমি, নগরে মাগিয়া দিব ঘরে বইসা খাইয়ো
রে নিমাই।

দেখ রে নদীয়াবাসী দেখরে চাহিয়া
আমার নিমাইচান সন্ন্যাসে যায় তার মায়েরে ছাড়িয়া
রে নিমাই।

[গানের মাঝামাঝি জানলার ভোলা খাবারের থালা রেখে ভেতরে চলে যায়। গান শেষ হতে সে আবার আসে। তার হাতে একটি থালায় চাল আর দুটি আলু। বাউলের ঝোলায় সে জিনিসগুলো ঢেলে দেয়।]

বাউল ॥ জয় হোক, জয় হোক্ বাবা—

[প্রস্থানোদ্যত]

ভোলা ॥ শোন!

বাউল ॥ কিছু বলবে?

ভোলা ॥ এইখানে এসে আর কোনদিন তুমি এই গানটা গেওনা। মা বলে দিলেন।

[প্রস্থান]

বাউল ॥ আচ্ছা বাবা তাই হবে।

নরেন ॥ কি ব্যাপার রে ভোলা? মা ও গানটা গাইতে বারণ করল কেন রে?

ভোলা ॥ তা কি করে জানব গো বাবু!

নরেন ॥ তুই অমনি বারণ করে দিলি? কি চমৎকার গানটা!

ভোলা ॥ মা বললেন, তাই ত।

নরেন ॥ কি যে হয়েছিস্ তোরা!

ভোলা ॥ খাবারটা খেয়ে নাও দাদাবাবু।

নরেন ॥ যা, যা, খুব হয়েছে।

[খাবার খেতে শুরু করে

ভোলা ॥ আমার ওপর মিথ্যে রাগ করছ। গানটা মার ভাল লাগেনি। তাই গাইতে বারণ করতে বললেন। এতে আমার কি দোষ?

[নরেনের খাওয়া শেষ হলে ভোলা থালা গেলাস নিয়ে চলে যায়। নরেনের কক্ষে অন্নদা প্রবেশ করে।]

নরেন ॥ কি রে অন্নদা, কি খবর?

অন্নদা ॥ এলুম তোর খবর নিতে।

নরেন ॥ বোস্। তোকে একটা নতুন গান শোনাই।

অন্নদা ॥ ওস্তাদ নতুন গান দিয়েছে বুঝি?

নরেন ॥ হঁ্যা।

অন্নদা ॥ গা, শুনি।

: নরেনের গান :

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া, যো কুছ হৈ সো তুঁহী হৈ
এক তুম্‌কা আপনা পায়া, যো কুছ হৈ সো তুঁহী হৈ ॥
সবকে মকান দিলকী মকীন তু, কৌন সা দিল হৈ জিসমে
নহী তুঁ
হর এক দিলমে তুঁ নে সমায়া, যো কুছ হৈ সো তুঁহী হৈ ॥
অর্শ সে লেকর যার্শ জমীন তক, ঔর জমীন সে অর্শ বরী তক্
যাহাঁ মৈঁ দেখা তুঁহী নজর মে আয়া, যো কুছ হৈ সো
তুঁহী হৈ ॥
সোচা সমঝা দেখা ভলা তু, য়্যাসা ন কোই ঢুঁড় নিকালা,
অব ইয়ে সমঝমে জাফর কী আয়া, যো কুছ হৈ সো
তুঁহী হৈ।

নরেন ॥ কি রে, কেমন লাগল ?

অন্নদা ॥ কি যে গলা তোকে ভগবান দিয়েছে !

নরেন ॥ তোর গলাটাও ত মন্দ ছিল না। খালি ফাঁকি দিবি আর হবে কোত্থেকে !

অন্নদা ॥ যাক্ গে। হ্যাঁ রে, ব্রাহ্মসমাজে যাস্ না ?

নরেন ॥ যাই মাঝে মাঝে। তবে কেউ যেন ঠিক পথ দেখাতে পারছে না।

অন্নদা ॥ কেন, দেবেন ঠাকুরের কথা শুনে খুবত ধ্যান করছিস্ আজকাল। তাতে কিছু ফল পেলি ?

নরেন ॥ ধ্যানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দেখা হয়ত পেলেও পেতে পারি। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, যতটা তন্ময়তা দরকার ততটা এখনো আমার আসেনি যে।

অন্নদা ॥ মাথা নেই তার মাথা ব্যাথা।

নরেন ॥ তুই ভগবানে বিশ্বাস করিস না, না রে অন্নদা?

অন্নদা ॥ আমি জানি ভগবান বলে কোন পদার্থ নেই।

নরেন ॥ আশ্চর্য! ভগবান আছেন—এই সত্যটা এত সহজ যে কারোরই দৃষ্টি এড়ানো উচিত নয়।

অন্নদা ॥ তুই প্রমাণ করতে পারিস্ যে ভগবান আছেন?

নরেন ॥ এক্ষুনি পারি।

অন্নদা ॥ সে কি রে! এ তুই কি বলছিস্!

নরেন ॥ ঠিকই বলছি।

অন্নদা ॥ কর্ দেখি প্রমাণ।

নরেন ॥ আচ্ছা, এই ঘরে যে সব জিনিসপত্র রয়েছে, এগুলো কোত্থেকে এল বল দেখি?

অন্নদা ॥ বিভিন্ন লোক এগুলো তৈরি করেছে।

নরেন ॥ বেশ। তুই যে চেয়ারটায় বসে আছিস্, সেই চেয়ারটা কে তৈরি করেছে?

অন্নদা ॥ ছুতোর মিস্ত্রি।

নরেন ॥ তাহলে এই চেয়ারটা তৈরির আগে ছুতোর মিস্ত্রির মনে এর পরিকল্পনা জেগেছিল?

অন্নদা ॥ নিশ্চয়!

নরেন ॥ কোন রকম পরিকল্পনা ছাড়া এই সামান্য চেয়ারটাও তাহলে সৃষ্টি হতে পারে না ?

অন্নদা ॥ সে কথা সত্যি।

নরেন ॥ আচ্ছা, চেয়ারটার যে কাঠ, সেটা ছুতোর মিস্ত্রি পেল কোথায় ?

অন্নদা ॥ কেন, গাছ থেকে।

নরেন ॥ গাছটা কে তৈরী করেছে ?

অন্নদা ॥ গাছ আবার তৈরি করবে কে ! ওটা পৃথিবীর বুকে আপনি হয়েছে।

নরেন ॥ পৃথিবীটা কে তৈরি করেছে ?

অন্নদা ॥ ওটাও হয়েছে আপনি। সূর্য থেকে খানিকটা অংশ খসে এসে মহাশূন্যে দলা পাকিয়ে গেছে।

নরেন ॥ সূর্যটা কে তৈরি করেছে ?

অন্নদা ॥ কেউ তৈরি করেনি। আপনা আপনিই ওর জন্ম।

নরেন ॥ তোর এই যুক্তিটা হাস্যকর হল না কি ?

অন্নদা ॥ কেন ?

নরেন ॥ তুচ্ছ একটা চেয়ার যেখানে কারোর বিনা পরিকল্পনায় বা বিনা ইচ্ছায় তৈরি হতে পারে না, তখন সেই চেয়ারটা যার থেকে এসেছে—অর্থাৎ পৃথিবী বা সূর্যের মত বিরাট বিরাট জিনিসগুলো আপনা আপনি তৈরি হয়ে গেল ?

অন্নদা ॥ তুই যেন আমার সব গুলিয়ে দিচ্ছিস্ নরেন। কিন্তু যাই বলিস্, ভগবানে বিশ্বাস আমার হবে না।

নরেন ॥ নাই হল। উপায় থাকলেও কোন অন্ধ যদি চক্ষুষ্মান হতে না চায়, তবে আমার বলবার কিছু নেই। আমি জানি ঈশ্বর আছেন। তবে শুধু জেনে লাভ নেই। আমি তাঁকে দেখতে চাই। আর সমাধি অভ্যাস করলে তাঁকে দেখতে পাব।

অন্নদা ॥ সেটা আবার কি রে ?

নরেন ॥ হেষ্টি সাহেব আজ বললেন কথাটা।

অন্নদা ॥ হেষ্টি সাহেব !

নরেন ॥ হ্যাঁ, আমাদের প্রিন্সিপাল।

অন্নদা ॥ কি বললেন ?

নরেন ॥ তিনি বললেন সমাধি বলে একটা অপূর্ব জিনিস আছে। অর্থাৎ অনুশীলন করলে মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্যে ঈশ্বরের সংগে সংযুক্ত করে দেওয়া যায়। তখন এই দেহবোধ থাকে না। সে বড় আনন্দের।

অন্নদা ॥ কি সূত্রে এ কথা বললেন ?

নরেন ॥ বললেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়াতে পড়াতে। ঐ কবির এই ধরনের সমাধি হত। গাছপালা নদী পাহাড় দেখলেই তিনি যেন কেমন হয়ে যেতেন। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না—মনপ্রাণ ভগবানে সংযুক্ত হয়ে যেত।

অন্নদা ॥ এ সংবাদে তোর কি লাভ হল ?

নরেন ॥ সেই কথাটা এবার বলছি। আমাদের এখানে নাকি একজন সাধু আছে যার এই রকম সমাধি হয়।

অন্নদা ॥ হেষ্টি সাহব এই কথা বললেন ?

নরেন ॥ হ্যাঁ।

অন্নদা ॥ সাধু থাকে কোথায় ?

নরেন ॥ দক্ষিনেশ্বরে।

অন্ননা ॥ ও, রামকৃষ্ণের কথা বলছিস্ ?

নরেন ॥ তুই চিনিস্ নাকিরে সাধুকে ?

অন্নদা ॥ খুব চিনি। বেটা ভণ্ড! হেষ্টি সাহেবের মাথায় ছিট্ আছে দেখছি।

নরেন ॥ সাধুটা বাজে, না ?

অন্নদা ॥ একেবারে।

নরেন ॥ আমিও তাই ভাবছিলুম। ঐ সব সো-কল্ড সাধু ফাধু কোনকালে ভগবানকে পায় না। ওদের ওপর আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। ও একটা ব্যবসা।

অন্নদা ॥ তাছাড়া কি। তোদের পাড়ার সুরেন মিত্তিরত আজকাল প্রায়ই দক্ষিনেশ্বরে যাতায়াত করছে।

নরেন ॥ তাই নাকি ? কই, উনি ত প্রায়ই আমার গান শোনেন। রামকৃষ্ণের কথাত শুনিনি কোনদিন !

অন্নদা ॥ যাতায়াত করছে অল্পদিন।

নরেন ॥ তুই সত্যি একটা গেজেট। সব খবর রাখিস্।

অন্নদা ॥ যাক, কি করবি এখন ?

নরেন ॥ দিদিমার বাড়ি পড়তে যাবো।

অন্নদা ॥ চল্ না, গড়ের মাঠ থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

নরেন ॥ না ভাই, পরীক্ষা এসে গেছে—

অন্নদা ॥ এসব ভাল ছেলেদের নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। রসকস কিচ্ছু নেই। যাক্, আমি একাই যাই—

নরেন ॥ আয় ভাই—

[অন্নদার প্রস্থান। একটু পরেই রামকাকার প্রবেশ।

রাম ॥ অন্নদাটা এসেছিল বুঝি?

নরেন ॥ হ্যাঁ।

রাম ॥ ও ছোঁড়াটার সংগে তুই মিশিস কেন বল্ ত?

নরেন ॥ কেন রামকা? কি হয়েছে?

রাম ॥ দূর দূর, ও ছোঁড়াটা হচ্ছে বড়লোকের নন্দ দুলাল। একেবারে মাকাল ফল। ভেতরে ভুসি। কি সুখ পাস ওর সংগে কথা বলে?

নরেন ॥ সকলের সংগে মেশাইত ভাল। দূরে সরিয়ে লাভ কি?

রাম ॥ যাক্, তোর সংগে কথা আছে।

নরেন ॥ বলো।

রাম ॥ তোকে বিয়ে করতে হবে।

নরেন ॥ নিশ্চয় মা তোমায় পাঠিয়েছে?

রাম ॥ যেই পাঠাক, আমার কথার জবাব দে।

নরেন ॥ আমার জবাব ত তুমি জানো।

রাম ॥ পারবি সারাজীবন বিয়ে না করে থাকতে?

নরেন ॥ কেন পারব না?

রাম ॥ বুকের জোর আছে?

নরেন ॥ দেখ না বুকে হাত দিয়ে।

রাম ॥ বেশ, করিসনি বিয়ে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় নরেন, তুই বিয়ে করে সংসার করার জন্যে জন্মাস্‌নি। তোর অনেক কাজ আছে—অনেক কাজ। বাঙালী জাতি ডুবতে বসেছে, হিন্দু ডুবতে বসেছে, ভারতবর্ষ ডুবতে বসেছে। চারিদিকে হাহাকার, নৈরাশ্য, পরাজয়ের মনোভাব। এমন একজন লোক চাই যে সকলকে ডেকে বলবে,—তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা অমৃতের সন্তান—চাই প্রচণ্ড পৌরুষ, চাই মৃত্যুকে তুচ্ছ করার মত দুর্জয় সাহস। আমার মনে হয় তুই এ কাজ পারবি নরেন।

নরেন ॥ ঈশ্বর করলে সবই সম্ভব।

রাম ॥ ঈশ্বর করবেন। আমার মন বলছে। ওসব ব্রাহ্মসমাজ-টমাজ ছেড়ে দে। তুই দক্ষিনেশ্বরে যা, পথ পাবি।

নরেন ॥ দক্ষিনেশ্বরে! তুমিও বলছ এই কথা?

রাম ॥ কেন, আর কে বলেছে?

নরেন ॥ ঐ অন্নদা বলছিল, ওখানে নাকি একটা ভণ্ড সাধু আড্ডা গেড়েছে!

রাম ॥ অন্নদার কথা শুনিসনি নরেন। ও সাক্ষাৎ শয়তানের চর।

[নেপথ্যে সুরেন মিত্তিরের গলা শোনা যায়: কই, নরেন বাবা কই?]

নরেন ॥ সুরেন কাকা এসেছেন এই যে, আসুন সুরেন কাকা, কি ব্যাপার?

স্থরেন ॥ এখুনি একবার আমার বাড়ি যেতে হবে বাবা !

নরেন ॥ কেন বলুন ত ?

স্থরেন ॥ দক্ষিনেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর এসেছেন আমার বাড়িতে। তিনি গান শুনতে চাইছেন।

রাম ॥ অ্যা! শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর! ওরে নরেন, এক্ষুনি চল, এক্ষুনি —এ যে এক মহালগ্ন উপস্থিত রে—চল, চল—

[পর্দা নামে]

———

প্রথম অংক

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্বোক্ত গৃহ। পরের দিন]

বিশ্বনাথ ॥ হ্যাঁ রে নরেন, তুই নাকি কাল রামকৃষ্ণ দেবকে গান শুনিয়ে এসেছিস্ ?

নরেন ॥ হ্যাঁ বাবা।

বিশ্বনাথ ॥ সাধু কেমন রে ?

নরেন ॥ দূর, দূর, ও একটা বাজে সাধু। সুরেনকাও যেমন !

বিশ্বনাথ ॥ কি বললে তোকে ?

নরেন ॥ কি আবার বলবে।

বিশ্বনাথ ॥ কথাবার্তা ত কিছু হয়েছে।

নরেন ॥ কত কি বক্ বক্ করল, সব মনেও নেই।

বিশ্বনাথ ॥ মোটামুটি কি বলল ?

নরেন ॥ আমায় দেখে চমকে উঠল। তারপর একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিশ্বনাথ ॥ তারপর ?

নরেন ॥ তারপর একটা আজগুবি কথা বললে

বিশ্বনাথ ॥ কথাটা কি রে ?

নরেন ॥ আকাশের সপ্তর্ষি মণ্ডলটা জান ত ?

বিশ্বনাথ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

নরেন ॥ বললে, ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলের আলো দিয়ে একটা দেবশিশু তৈরি হয়েছে। সে পৃথিবীতে এসেছে আর সংগে ডেকে নিয়ে এসেছে সাত ঋষির এক ঋষিকে।

বিশ্বনাথ ॥ কথাটার মানে কি হল?

নরেন ॥ বুঝলে না? ঐ শিশু হচ্ছে রামকৃষ্ণ আর আমি হলাম ঐ ঋষি।

বিশ্বনাথ ॥ ষ্ট্রেঞ্জ! এসব কথার তাৎপর্য কি? আমিও অবশ্য ওসব সাধুটাধুতে বিশ্বাস করি না। তবে এটাও ঠিক, দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন্ এণ্ড আর্থ, হোরেসিও, দ্যান আর ড্রেম্‌ট্ অব্ ইন্ ইওর ফিলসফি।

নরেন ॥ সাধুর ওসব কথার কোন মানেই নেই বাবা, লোকটা ম্যানিয়াক্।

বিশ্বনাথ ॥ আর কি বললে তোকে?

নরেন ॥ সুরেন কাকাকে আমার সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলে—আমি কে, কার ছেলে, আমার বাবা কি করেন, আমি কি করি, কত নম্বর বাড়িতে থাকি, এই সব।

বিশ্বনাথ ॥ এসব খোঁজ নিচ্ছে কেন রে?

নরেন ॥ কে জানে, চেলাটেলা করবার তালে আছে বোধ হয়।

বিশ্বনাথ ॥ তোকে আর কিছু বলেনি?

নরেন ॥ আমার কাছে এসে আমার হাতখানাকে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। তারপর বললে, "ঠিক যেন শ্রীরামচন্দ্র।" একদিন আমায় দক্ষিনেশ্বরে যেতে বললে—অনেক করে।

বিশ্বনাথ ॥ তুই যাবি নাকি ?

নরেন ॥ তুমি খেপেছ !

বিশ্বনাথ ॥ আমার কোন আপত্তি নেই। ইউ আর এ ম্যান নাও। ইউ ক্যান গো এনিহোয়ারা ইউ লাইক। তবে তোর মা এটা পছন্দ করে না। সে চায় না তুই সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যাস্। ইউ মাইট্ মেক ইওর মাদার হ্যাপি।

নরেন ॥ আমি ত বলছি বাবা যাব না।

বিশ্বনাথ ॥ রামকৃষ্ণদেব তোর গান শোনেনি ?

নরেন ॥ শুনেছে।

বিশ্বনাথ ॥ কোন্‌টা ?

নরেন ॥ নতুন খানা।

বিশ্বনাথ ॥ শুনে কি বললে ?

নরেন ॥ শুনতে শুনতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

বিশ্বনাথ ॥ সে কি রে !

নরেন ॥ ও কিছু নয়। ফিট হওয়ার মত একটা বিকার।

বিশ্বনাথ ॥ তোর মার কাছে এসব কথা বলেছিস্ ?

নরেন ॥ এখনো শোনেনি।

বিশ্বনাথ ॥ তাহলে আর বলে কাজ নেই।

নরেন ॥ মার মিথ্যে ভয়।

বিশ্বনাথ ॥ মিথ্যে ত বটেই, তবে ভয় ত। কাল রাত্তিরে তুই যখন রামকৃষ্ণদেবকে গান শোনাতে গেলি, তখন তোর মা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, আমাকে কত কথা বলছিল।

নরেন ॥ কি কথা বাবা ?

বিশ্বনাথ ॥ ঐ তোর ঠাকুদ্দার কথা। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন, তুইও যদি তেমনি—

নরেন ॥ কি যে বলো! আমি সন্ন্যাসী হবো কি জন্যে?

বিশ্বনাথ ॥ সে ত আমি বুঝি, কিন্তু তোর মা বোঝে না। তা, বোঝে না যখন, তখন ঐ সব সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে ওঁর মনে কষ্ট না দেওয়াই ভাল।

নরেন ॥ আমি কি আর নিজের ইচ্ছায় গেছি, সুরেনকা বলল তাই গেলাম।

বিশ্বনাথ ॥ যাক্, তোর মাকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিস্। তাহলেই হবে। (প্রস্থান করতে করতে) ওরে ভোলা, কচুয়ানকে গাড়িটা বের করতে বল, বেরোব।

[প্রস্থান]

[নেপথ্যে বাউলের গান শোনা যায় ঃ]

কোথায় থেইকা আইলো রে গুরু বসতে দিলাম ঠাঁই
প্রভাতে উঠিয়া রে দেখি, নিমাই ঘরে নাই
রে নিমাই।

[ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে]

———

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[দক্ষিনেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের গৃহ। মঞ্চটি দু'ভাগে ভাগ করা। ডান দিকে (অভিনেতাদের দিক থেকে) শ্রীরামকৃষ্ণের শয়ন গৃহ। সেখানে একটি চৌকির ওপর বিছানা পাতা। বাঁ দিকে চওড়া বারাণ্ডা। বারাণ্ডায় মাদুর। বারাণ্ডা থেকে বাইরের বাগান আর কালীমন্দিরের কিয়দংশ নজরে পড়ে। শয়নগৃহ আর বারাণ্ডার মাঝখানে দরজা। রামকৃষ্ণদেব প্রবেশ করেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে ও লেটো—

[লেটো অর্থাৎ লাটুর প্রবেশ]

লাটু ॥ কি বলছেন গো বাবাঠাকুর?

রামকৃষ্ণ ॥ হাজরা কোথায় রে?

লাটু ॥ খেয়ে আঁচাচ্ছে। ডেকে দোব?

রামকৃষ্ণ ॥ এর মধ্যে খেল কি রে? রাত এখন কটা?

লাটু ॥ তা আটটা হবে। দেরি করে আর লাভ কি!

রামকৃষ্ণ ॥ তোরও খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়?

লাটু ॥ (সলজ্জ ভংগিতে) আজ্ঞে—

রামকৃষ্ণ ॥ তোরা দুই শালাই বকরাক্ষসের মত পেটুক। তোদের কিস্সু হবে না। যা—হাজরাকে পাঠিয়ে দে—

[লাটুর প্রস্থান। রামকৃষ্ণ নিজের বিছানায় এসে বসেন। হাজরার প্রবেশ।]

হাজরা ॥ আমায় ডেকেছেন?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ রে শালা হ্যাঁ, ডেকেছি। বোস্।

[হাজরা মাটিতে বসে]

কি মতলবরে তোর অ্যাঁ ?

হাজরা ॥ কি প্রভু ?

রামকৃষ্ণ ॥ ওঃ প্রভু ! শালা পাকা বেনে ! লক্ষ্মীনারাণ মাড়োয়ারির সংগে কি ফিসফাস করছিলি ?

হাজরা ॥ আমি কিচ্ছু বলিনি। ওর ব্যবসাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেই কথাই ও বলছিল।

রামকৃষ্ণ ॥ হুঁ, সেইজন্যেই অত খাবার আনার ঘটা ! তা, খাবারগুলো সব গংগায় ফেলে দিতে বলেছিলুম— দিয়েছিস্ত ফেলে ? (হাজরা নিরুত্তর) কি রে, কথা বলছিস্ না কেন ? (হাজরা তবু নিরুত্তর) আরে শালা বোবা বনে গেলি নাকি ?

হাজরা ॥ আজ্ঞে ফেলিনি।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে কি করলি ?

হাজরা ॥ আমি আর লেটো—দুজনে মিলে খেয়ে দিইছি।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে শালা লোভী, ঐ খাবারগুলো খেলি ! ঐ খাবারে যে কামনা মাখানো রে। ওর কারবারে যাতে বেশি লাভ হয় সেই আশা নিয়ে লক্ষ্মীনারাণ আমার জন্যে খাবার এনেছিল—ভালবেসে আনেনি। খাবারগুলো খেয়ে মহাপাপ করেছিস্।

হাজরা ॥ অত ভাবলে চলে না।

রামকৃষ্ণ ॥ হুঁ। শালা যে অনেক কিছু বুঝে ফেলেছিস রে, অ্যাঁ? তুই এখানে পড়ে আছিস্ কেন বল্ ত?

হাজরা ॥ সাধনা করব বলে।

রামকৃষ্ণ ॥ কিসের সাধনা?

হাজরা ॥ ভগবানকে পাবার।

রামকৃষ্ণ ॥ শালা মিথ্যেবাদী। মনে মনে খালি ব্যবসাদারী প্যাঁচ। সাধনা করবি ত বড়লোক ভক্ত এলেই তার সংগে বেশি খাতির জমাতে চাস্ কেন বল্ ত? তোরা কেউ আমার মনেব মত নোস্। হ্যাঁ, মনের মত একজনকে দেখেছিলুম বটে।

হাজরা ॥ সে কে?

রামকৃষ্ণ ॥ সিমলের নরেন। সুরেন মিত্তিরের বাড়ি ভজন গেয়েছিল। খাসা গলা! ছোঁড়াটার জাতটা বড় ভাল। কিন্তু ওকে যে একদিন আসতে বলেছিলুম! অনেকদিন হয়ে গেল. এল না ত!

[লাটুর প্রবেশ]

লাটু ॥ বাবাঠাকুর, ও বাবাঠাকুর, সুরেনবাবু এয়েছেন আর ওনার সংগে একজন খুব সুন্দোরপানা অল্প বয়সের বাবু—

রামকৃষ্ণ ॥ অ্যাঁ। কি বলছিস্ রে? কে এসেছে? সুন্দোরপানা বাবু?

লাটু ॥ হ্যাঁ গো বাবাঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে, ওরে, এ ত আর কেউ নয় রে!

[উত্তেজনায় উঠে বারাণ্ডায় আসেন]

নিশ্চয় সে এসেছে রে, নিশ্চয় সে এসেছে !

লাটু ॥ আপনি উঠলেন কেন ? ওয়াত এই ঘরেই আসবে।

রামকৃষ্ণ ॥ না রে না, আমি আর স্থির থাকতে পারছি না !

[সুরেন মিত্র, নরেন এবং অন্য দু'জন যুবকের প্রবেশ ।]

সুরেন ॥ কাকে নিয়ে এসেছি দেখুন বাবাঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে আয়, আয়, এত দেরি করতে হয় ! আমি যে কতদিন ধরে তোর পথ চেয়ে বসে আছি। ওরে হাজরা—

হাজরা ॥ বলুন প্রভু।

রামকৃষ্ণ ॥ যা, যা, মিষ্টি নিয়ে আয়—তিনজনের জন্যে আনবি—

লাটু ॥ লোক ত চারজন গো বাবাঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই থাম্। যা, যা, হাজরা, তিনজনের জন্যে আনলেই চল্‌বে। আর লেটো, তুইও যা, ডিস্ গেলাস সব ঠিকঠাক কর্—

[হাজরা ও লাটুর প্রস্থান]

এই বারাণ্ডাতেই বসা যাক্। কি বলগো সুরেন। দিব্যি হাওয়া এখানে। বোসো বাবারা সব।

[সকলের উপবেশন]

সুরেন ॥ অনেকদিন থেকেই নরেনকে বলছি এখানে আসার জন্য। আজ একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে এলুম।

রামকৃষ্ণ ॥ বেশ করেছ। ওকে যে আসতেই হবে এখানে। (নরেনকে) নে নরেন, এবার একটা গান লাগা। বাংলা গাইবি, বুঝলি ? বাংলা গান জানিস্‌ত ?

শিখেছি খান তিনেক।

। নে, তবে ধর্।

: নরেনের গান :

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে ॥

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেউ নয় আপন
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন
ভুলিছ আপন জনে ॥

লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্বস্ব হরণ
পরম যতনে রাখরে প্রহরী
শম দম দুই জনে ॥

সাধু সংগ নামে আছে পান্থ ধাম
শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ
সে পান্থ নিবাসী জনে ॥

যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন ডরে যার শাসনে ॥

[গান শুরু হবার সংগে সংগে রামকৃষ্ণ 'আহা' 'আহা' করে মাথা দোলাতে শুরু করেন। একটু পরে তাঁর দেহ স্থির হয়ে যায়। বোঝা যায় তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন। গান থামার পরও তিনি স্থির হয়ে থাকেন।]

সুরেন ॥ দেখেছিস নরেন, সমাধি কাকে বলে ?

নরেন ॥ এ এক ধরনের ফিট—যাদের খুব বেশি ভাবাবেগ, তাদের হয়। সমাধি টমাধি কিছু না।

সুরেন ॥ ঈশ্বর চিন্তায় ফিট্ হওয়াটাই যে সমাধি রে !

নরেন ॥ রোগ রোগই—সে যে চিন্তাতেই হোক্। তা উনি কতক্ষণ এভাবে থাকবেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ (সমাধি ভংগ হয়) আঃ কি আনন্দ !

[মিষ্টি হাতে লাটুর প্রবেশ।]

দে, এদের তিনজনকে দে—(নরেনকে) তুই আয় ত আমার সংগে।

নরেন ॥ কোথায় ?

রামকৃষ্ণ ॥ বেশি দূরে কোথাও নয়রে, এই ঘরে। আয়, আয়, ওঠ—

নরেন ॥ ও ঘরে যাবো কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ (ঈষৎ ধমকের সুরে) যা বল্‌ছি শোন্—আয়—

[রামকৃষ্ণ ঘরে ঢোকেন। নরেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করে। নরেন ঢোকবার পর রামকৃষ্ণ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেন।]

নরেন ॥ দরজা বন্ধ করলেন কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ তোর ভয় করছে নাকিরে ? বলি, আমি ভূত না প্রেত।

নরেন ॥ ভূত প্রেতের ভয় আমার নেই।

রামকৃষ্ণ ॥ জানি, জানি, তুই বীরপুরুষ। তা, এত দেরি করে আসতে হয় ! কত কথা আমার বলবার আছে—শোনাবার লোক পাচ্ছি না। বিষয়ী লোকদের সংগে কথা বলতে বলতে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছে। এমনি করে কষ্ট দিলি আমায় ? হ্যাঁরে—

নরেন ॥ আপনি কি বলছেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ আমার সংগে কেন ছলনা করছিস ? আমি কি বলছি তা কি বুঝতে পারছিস না ?

নরেন ॥ না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

রামকৃষ্ণ ॥ যতই তুমি আমায় ঠকাতে চাও ঠাকুর, আমি কিন্তু ঠকবো না। একবার দেখা যখন পেয়েছি, তখন অন্তরে বেঁধে রাখব। দেখি তুমি কেমন করে পালাও !

নরেন ॥ পাগল নাকিরে বাবা !

রামকৃষ্ণ ॥ (হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে) আমি তোমায় চিনেছি প্রভু। আমায় তুমি ফাঁকি দেবে ? তুমিত সেই পুরান পুরুষ, সেই পরমনিদান—

নরেন ॥ আজ্ঞে না, আমি ওসব কিছু নয়। আমি এটর্নী বিশ্বনাথ দত্তর ছেলে। শিগগির এফ. এ. পরীক্ষা দেব।

রামকৃষ্ণ ॥ আমায় আর ওসব কথা বলে ভোলাতে পারবে না ঠাকুর। তুমি সপ্তর্ষি মণ্ডলের সেই ঋষি, তুমি নররূপী নারায়ণ, জীবের দুঃখ হরণ করতে আবার তুমি শরীর ধারণ করেছ।

নরেন ॥ এ নির্ঘাৎ উন্মাদ।

রামকৃষ্ণ ॥ বোস, বোস, আমার ঘরে ভাল সন্দেশ আছে। কি মনে করে আজ আনিয়ে রেখেছিলুম। তোকে খেতে হবে।

নরেন ॥ না, না, আমি বারাণ্ডায় যাই। ওখানে আমার বন্ধুরা রয়েছে। (ওঠে)

রামকৃষ্ণ ॥ (ঈষৎ ধমকের সুরে) থাম্ থাম্। বন্ধু! বন্ধু! কে কার বন্ধুরে? শিগগির বোস বলছি।

[নরেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে পড়ে। রামকৃষ্ণ তাক থেকে ডিসে করে সন্দেশ এনে নরেনকে খেতে দেন।]

নরেন ॥ এত সন্দেশ আমি খেতে পারবো না। বাইরে গিয়ে বন্ধুদের সংগে ভাগ করে খাই।

রামকৃষ্ণ ॥ খবরদার, এগুলো সব তোকে একা খেতে হবে। আমায় তুই আর কত কাঁদাবিরে? (ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন।)

নরেন ॥ আচ্ছা বাবা খাচ্ছি। মহা ফ্যাসাদে পড়েছি যা হোক্।

[নরেন খেতে আরম্ভ করে। রামকৃষ্ণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ খা, খা, বড় ভাল লাগছেরে তোকে খাওয়াতে—বড় ভাল লাগছে—

[নরেন আস্তে আস্তে সব সন্দেশগুলো খেয়ে ফেলে।]

নরেন ॥ নিন্, হল ত? সব খেয়ে ফেললুম।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে যে বলছিলি পারবি না! আমি দিয়েছি আর তুই খেতে পারবি না, তা কি কখনো হয় রে?

নরেন ॥ এবার তাহলে ওঠা যাক্।

রামকৃষ্ণ ॥ আবার কবে আসবি বল্।

নরেন ॥ দেখি।

রামকৃষ্ণ ॥ দেখি না, আমায় কথা দে।

নরেন ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, আসব।

রামকৃষ্ণ ॥ কবে?

নরেন ॥ সেটা কি করে বলি।

রামকৃষ্ণ ॥ বলতেই হবে। খুব তাড়াতাড়ি আসবি ত?

নরেন ॥ চেষ্টা করব।

রামকৃষ্ণ ॥ চেষ্টা নয়, আসতেই হবে।

নরেন ॥ ঠিক আছে। খুব তাড়াতাড়ি আসব।

রামকৃষ্ণ ॥ আর একটা কথা।

নরেন ॥ বলুন।

রামকৃষ্ণ ॥ একা আসবি। কোন বন্ধু বান্ধব সংগে আনবি না।

নরেন ॥ এতটা পথ একা একা আসতে কি ভাল লাগে?

রামকৃষ্ণ ॥ কত পথ তোকে একা চল্‌তে হবে তার ঠিক নেই! কি রে, একা আসবি ত?

নরেন ॥ আচ্ছা, একাই আসব।

রামকৃষ্ণ ॥ বেশ, আজ তাহলে আয়।

[নরেন উঠে ঘরের দরজা খুলে বারাণ্ডায় যায়]

ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে

দ্বিতীয় অংক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। সন্ধ্যাকাল। রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে চঞ্চল দেখাচ্ছে। তিনি একবার বিছানায় বসছেন, আবার উঠে ঘরের মধ্যে, ঘরের বারাণ্ডায় পায়চারি করছেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) আমার কাছে একবার ওকে এনে দে মা, আমার কাছে একবার ওকে এনে দে। কেন আসবে না ও—কেন? কেন? আমি যে ওর মধ্যে দেখেছি সেই শক্তি! তবে কেন এতদিনেও সে এল না! আমার বুকটা যে যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে মা, পুড়ে যাচ্ছে!

[হাজরার প্রবেশ]

হাজরা ॥ আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ ॥ কে রে, হাজরা?

হাজরা ॥ হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে রে!

হাজরা ॥ কেন ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ ॥ নরেন ত আর এল না!

হাজরা ॥ ও, সিমলের সেই ছেলেটি?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁরে, ও যে আমায় কথা দিয়ে গেল খুব শিগ্‌গির আসবে, অথচ দেড় মাস কেটে গেল এখনও ওর দেখা নেই।

হাজরা ॥ ছেলে ছোকরাদের কি আর সাধু সংগ ভাল লাগে! তা ছাড়া, ও কলেজে ইংরিজি পড়ে—

রামকৃষ্ণ ॥ তা পড়লেই বা। তুই জানিস না হাজরা ওর ভেতর কি আছে! ও সাধারণ মানুষ নয় রে!

হাজরা ॥ কি এমন অসাধারণ ওকে দেখলেন?

রামকৃষ্ণ ॥ সে তুই বুঝবি না।

হাজরা ॥ তা না বুঝতে পারি। তবে এটা বুঝছি একজনের মিথ্যে আশায় থেকে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ নরেন যে আমায় কথা দিয়ে গেছলরে খুব তাড়াতাড়ি আসবে।

হাজরা ॥ তা যদি না-ই আসে, তার জন্য এত মন খারাপ করছেন কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ তাকে যে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে রে হাজরা।

হাজরা ॥ আপনি সাধু মানুষ, আপনার এত মায়ার বাঁধন কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে শালা পাটোয়ারি—খুব যে কথা শিখেছিস্!

হাজরা ॥ হাজরা যা বলে হক্ কথা।

রামকৃষ্ণ ॥ থাম্, থাম্ বেটা। মায়া কাকে বলে জানিস? মায়া আমার কাছে মহামায়া হয়ে আসে।

[লাটুর প্রবেশ]

লাটু ॥ ঠাকুর, ঠাকুর, সুরেন মিত্তির এয়েচে।

রামকৃষ্ণ ॥ অ্যাঁ! তবে ত নরেনও এসেছে।

[উত্তেজনায় উঠে পড়ে! যেন নরেনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে যায়।]

ওরে, আয়, আয়, এত দেরী করতে হয়। তুই কি কঠিন রে!

লাটু ॥ কাকে বলছেন গো। নোরেনবাবু ত আসেনি।

[সুরেন মিত্রের প্রবেশ]

রামকৃষ্ণ ॥ অ্যা! নরেন আসেনি!

সুরেন ॥ কেন, নরেনের আজ আসার কথা ছিল নাকি?

রামকৃষ্ণ ॥ আসার কথা ত ওর অনেক আগেই। তা আমি ভাবলাম, তোমার সংগে হয়ত এসেছে।

সুরেন ॥ ওকি আর আসবে!

রামকৃষ্ণ ॥ কেন? কেন?

সুরেন ॥ ও সাধু টাধু মানে না, ব্রাহ্ম সমাজে যায়।

রামকৃষ্ণ ॥ তা গেলেই বা—তাতে কি হয়েছে।

সুরেন ॥ তা ছাড়া—

রামকৃষ্ণ ॥ তা ছাড়া আবার কি গো—

সুরেন ॥ সে আপনাকে বিশ্বাস করে না।

রামকৃষ্ণ ॥ কি করে বুঝলে?

সুরেন ॥ বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলছিল যে।

রামকৃষ্ণ ॥ কি বলছিল?

সুরেন ॥ বলছিল, আপনি—

রামকৃষ্ণ ॥ অত লজ্জা কি, বল না গো—

সুরেন ॥ বলছিল আপনি এক ধরনের পাগল

রামকৃষ্ণ ॥ হা হা হা হা—বড় ভাল বলেছে ত নরেন। খুব সত্যি কথা বলেছে। বেটি আমায় পাগল করে দিয়েছে—এতো খাঁটি কথা!

সুরেন ॥ আপনি সব কথারই অন্য মানে করেন।

রামকৃষ্ণ ॥ না গো না, অন্য মানে বাদ দিয়ে আসল মানে করি। জগতে যত মিথ্যে মানে নিয়ে চেঁচামেচি—হৈ চৈ। কিন্তু আসল মানে ত মোটে একটা। সেটা যদি সবাই বুঝত।

সুরেন ॥ সে মানেটা কি?

রামকৃষ্ণ ॥ এবার তোমার প্রশ্নটা বাবু ঐ হাজরার মত হল—বিনা খাটুনিতে চট্ করে কিছু লাভ করে নেওয়া। দেখ, যে মানেটার কথা বলছি, সেটা কি আর ঐ ইস্কুলের পড়ার বইয়ের কোন মানের মত যে বলে দিলেই বুঝে নেবে? সে মানেটা যে প্রাণের ভেতর থেকে জন্মায়।

সুরেন ॥ আপনার দয়া হলে তবে ত প্রাণের মধ্যে জন্মাবে।

রামকৃষ্ণ ॥ তোমাদের বাপু বড় বেনে বুদ্ধি। নিজে কিছু করব না, সব চাপিয়ে দোব আর একজনের ঘাড়ে, অ্যাঁ?

সুরেন ॥ আমরা দুর্বল মানুষ।

রামকৃষ্ণ ॥ দুর্বল দুর্বল করে নিজেরাই দুর্বলতা ডেকে আনো। তোমার কিসের দুর্বলতা?

সুরেন ॥ আজ্ঞে সংসারী মানুষ। মনে কত মোহ, কত ভ্রান্তি।

রামকৃষ্ণ ॥ তোমার মনটা কার?

সুরেন ॥ আজ্ঞে ভগবানের।

রামকৃষ্ণ ॥ তোমার মোহ? তোমার ভ্রান্তি?

সুরেন ॥ আজ্ঞে সেগুলোও ভগবানের।

রামকৃষ্ণ ॥ বুলি ত খুব শিখেছ, তবে প্রাণে বিশ্বাস নেই কেন? বলি, তোমার মন, মোহ, ভ্রান্তি যদি ভগবানের, তবে সেগুলো আবার দুবল হয় কি করে? যিনি অনন্ত শক্তির অধিকারী, তাঁর জিনিসে আবার দুর্বলতা আসে কোথেকে? তোমার যত মোহ আর ভ্রান্তিগুলোকে ঈশ্বর বলে জড়িয়ে ধর, দেখবে সেগুলো এক একটা বজ্রের মত হয়ে তোমাকে সবল করে তুলেছে।

সুরেন ॥ (রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিয়ে) আপনি ভগবান।

রামকৃষ্ণ ॥ যাও, যাও, আজ বাড়ি যাও। আজ আমায় একটু একা থাকতে দাও।

সুরেন ॥ আচ্ছা, আসি তাহলে। [প্রস্থান]

[চৌকির বিছানার ওপর রামকৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকেন। তাঁর নয়ন নিমীলিত। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়। নরেনের প্রবেশ। তাকে বারাণ্ডায় দেখা যায়। রামকৃষ্ণ চোখ না খুলেই নরেনের আগমন টের পান

রামকৃষ্ণ ॥ আয়, এখানে চলে আয়।

নরেন ঘরে ঢুকে চৌকির কাছে এসে দাঁড়ায়।]

রামকৃষ্ণ ॥ বোস, আমার পাশে বোস।

[নরেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে। রামকৃষ্ণ চোখ মেলে তাকান।]

কিরে, এই তোর খুব তাড়াতাড়ি আসা? দেড় মাস পার হয়ে গেল তবু দেখা নেই!

নরেন ॥ কি হবে আপনার কাছে এসে।

রামকৃষ্ণ ॥ মানে?

নরেন ॥ মানে, সাধু সন্ন্যাসীর ওপর আমার বিশ্বাস নেই। কথা দিয়েছিলুম, তাই এলুম।

রামকৃষ্ণ ॥ ও, এই কথা। তা দেখ, আমি সাধুও নই সন্নিসিও নই। দিব্যি বিয়ে থা করিছি—প্রায় সংসারী। তবে মায়ের নাম করতে ভালবাসি—এই যা।

নরেন ॥ কে আপনার মা?

রামকৃষ্ণ ॥ ঐ যে ওদিকের মন্দিরে আছে।

নরেন ॥ কালী ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালী করালী—যে কালকে গ্রাস করে ফেলে। বেটি কি কম!

নরেন ॥ বেশ বুঝতে পারছি, আপনার কাছে এসে আমার কিচ্ছু লাভ হবে না।

রামকৃষ্ণ ॥ কেন রে?

নরেন ॥ আমি যাকে খুঁজছি তার সন্ধান কেউ দিতে পারেনি—কত লোকের কাছেই ত গেলুম। আপনিও দিতে পারবেন না।

রামকৃষ্ণ ॥ কাকে খুঁজছিস রে?

নরেন ॥ ভগবানকে।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই ত আচ্ছাই বোকা দেখছি!

নরেন ॥ কেন? বোকা কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ নয়ত কি ! কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজতে হয়। কেউ যদি দূরে থাকে বা আড়ালে থাকে তবে তাকেও খুঁজতে পারিস। কিন্তু ভগবানকে খুঁজবি কেন? সে কি হারিয়ে গেছে না দূরে আছে না আড়ালে আছে ?

নরেন ॥ সে তবে কোথায় ?

রামকৃষ্ণ ॥ সে ত সর্বত্র। এই আকাশে বাতাসে ফুলে ফলে মাটিতে পাহাড়ে নদীতে মরুতে—প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে—তোর সারা দেহে—তোর মনেপ্রাণে—তাকে আবার খুঁজবি কি রে ? তাকে ত চাইলেই পাওয়া যায়।

নরেন ॥ আপনি পেয়েছেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ কেন পাবো না।

নরেন ॥ আমিও ত চাই, তবে পাচ্ছি না কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ চাওয়ার মত চাইতে হবে।

নরেন ॥ সেটা কেমন ?

রামকৃষ্ণ ॥ শোন্ তবে একটা গল্প বলি। একবার একটি ছেলে এক ব্রাহ্মণকে এসে জিগ্যেস করলে, ভগবানকে পেতে হলে কেমন করে চাইতে হবে ? ব্রাহ্মণ বললে, আমার সংগে এসো বুঝিয়ে দিচ্ছি। তারা দুজনে একটা পুকুর ধারে গেল। ব্রাহ্মণ জলে নাবলো, ছেলেটিকেও নাবালো। ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে ডুব দিতে বলল। যেই ডুব দিয়েছে, অমনি ব্রাহ্মণ ছেলেটির মাথাটা জলের ভেতর চেপে বসে রইল। ছেলেটি হাঁসফাঁস করতে লাগল তবু ব্রাহ্মণ তাকে ছাড়ল না। যখন প্রাণ যায় যায়, তখন ছেড়ে দিল।

ছেলেটি জল থেকে মাথা তুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। তখন ব্রাহ্মণ বললে, বাতাস পাবার জন্য তুমি কতটা আকুল হয়েছিলে? ছেলেটি বললে, ওরে বাবা, এ আকুলতার তুলনা নেই। ব্রাহ্মণ তখন বললে, এই রকম আকুলতা দিয়ে ভগবানকে চাইলেই তুমি তাকে পাবে।

নরেন ॥ দিব্যি একটা গল্প ফাঁদলেন ত?

রামকৃষ্ণ ॥ গল্পের মানেটা খাঁটি কিনা বল্?

নরেন ॥ সত্যি, গল্পের মূল কথাটা আমার বড় ভাল লাগল।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে?

নরেন ॥ কিন্তু আপনি যে ভগবান পেয়েছেন বললেন, তার প্রমাণ কই?

রামকৃষ্ণ ॥ প্রমাণ আবার কি রে। তার সংগে ত রোজ আমি কথা বলি।

নরেন ॥ ভগবানের সংগে?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ।

নরেন ॥ কোথায়?

রামকৃষ্ণ ॥ ঐ মন্দিরে।

নরেন ॥ ওখানে ভগবান আসেন?

রামকৃষ্ণ ॥ ওখানেই ত আমার মা বেটি থাকে।

নরেন ॥ ঐ কালী মূর্তির কথা বলছেন?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ রে।

নরেন ॥ ও ত পাথরের।

রামকৃষ্ণ ॥ না রে, ও চিন্ময়ী। আমি যখন মনপ্রাণ ঢেলে ওকে ডাকি, ও তখন মানুষের মত আমার সংগে কথা বলে।

নরেন ॥ সত্যি ?

রামকৃষ্ণ ॥ তুই কি ভাবছিস তোকে আমি মিথ্যে বলছি ? আমার হাত থেকে ও নৈবেদ্য পর্যন্ত খেয়ে যায়।

নরেন ॥ এ সব আমি বিশ্বাস করি না।

রামকৃষ্ণ ॥ আজ না করিস, একদিন করবি।

নরেন ॥ কোনকালেও করব না। এ একরকম মনের ব্যাধি।

রামকৃষ্ণ ॥ কোনটা রে ?

নরেন ॥ এই যে আপনি বলছেন মা কালী আপনার সংগে কথা বলে—আপনার হাত থেকে ফলমূল খেয়ে যায়—

রামকৃষ্ণ ॥ সেকি রে ! এটা আমার মনের রোগ ?

নরেন ॥ নিশ্চয়। ইংরেজিতে একে বলে mania. এ রোগ হলে মানুষ নিজের সম্পর্কে নানারকম আজগুবি কল্পনা করে তার মনে মনে ভাবে সত্যি সত্যি ঘটনাগুলো ঘটছে। আসলে কিন্তু কোন ঘটনাই ঘটছে না। শুধু কল্পনা খুব তীব্র হওয়ার দরুণ মনে হয় ঘটনাগুলো ঘটছে।

রামকৃষ্ণ ॥ কল্পনা তীব্র হলে—ঘনীভূত হলেই যে ঘটনা হয়ে যায় রে।

নরেন ॥ তা কখনও হয় না। আসলে ঐ ব্যাধি থেকেই মাথায় এই ধরনের চিন্তার উদয় হয়।

রামকৃষ্ণ ॥ তাহলে তুই বলছিস এ আমার মনের ব্যামো ?

নরেন ॥ এতে আর কোন ভুল নেই।

রামকৃষ্ণ ॥ তোদের ইংরিজি বইতে লেখা আছে ?

নরেন ॥ নিশ্চয়। কত বড় বড় পণ্ডিত এই সব নিয়ে গবেষণা করে মনের আসল রহস্যটা বের করে ফেলেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ তাহলে ত বড় মুস্কিল হল রে। আমি একটা ব্যামোতে ভুগছি ?

নরেন ॥ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই যখন বলছিস, তখন হয়ত হতেও পারে। দেখি, আজই বেটিকে জিগ্যেস করব—আজ রাত্তিরেই—হ্যাঁ।

নরেন ॥ সেখান থেকে কি উত্তর পাবেন ? ঐ উত্তর পাওয়াটাই ত আপনার রোগ। আপনার মনের কামনাটাই আপনার কাছে উত্তর হয়ে আসবে।

রামকৃষ্ণ ॥ তাই নাকি রে ? অ্যাঁ ? ঠিক বল্‌ছিস্ ? ঠিক করে বল ?

[কথাগুলো বলতে বলতে রামকৃষ্ণদেব কেমন যেন বিহ্বল হয়ে নরেনের দিকে বসে বসেই এগিয়ে আসেন।]

নরেন ॥ এ কি! আমার দিকে আপনি অমন করে এগিয়ে আসছেন কেন ? এঁকি!

[রামকৃষ্ণঠাকুর সহসা তাঁর ডান পা'খানা নরেনের কোলের ওপর তুলে দেন। তাঁদের চারপাশে একটা আলোর বৃত্ত তীব্র বেগে পাক খেতে থাকে।]

একি হল! সর্বনাশ! এ আমি কোথায় চলেছি! ঘর বাড়ি, এই পৃথিবীটা, কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র উল্কাবেগে ছুটে চলেছে মহাশূন্য দিয়ে—আর তার সংগে ছুটে চলেছে

আমার আমিত্ব! আমি কি তবে ধ্বংস হয়ে যাব? সর্বনাশ! আমাকে বাঁচাও – বাঁচাও— ওগো, আমার যে বাপ মা আছে গো—আমার যে বাপ মা আছে।

রামকৃষ্ণ ॥ (নরেনের মাথায় হাত রেখে) হা-হা-হা-হা-হা—এতেই ভয় পেয়ে গেলি? থাক্, থাক্, আজ এইটুকুই থাক্, আস্তে আস্তে হবে।

নরেন ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) একি করলেন আপনি? হঠাৎ এরকম হল কি করে?

রামকৃষ্ণ ॥ আমার যে মাকে তুই অবিশ্বাস করিস, সে তোকে একটু ছুঁয়েছিল।

নরেন ॥ না, না, আপনি নিশ্চয়ই হিপ্‌নোটিজম জানেন।

রামকৃষ্ণ ॥ ওটা আবার কি কথা রে?

নরেন ॥ ওটা একটা ইংরিজি কথা। ওর মানে সম্মোহন বিদ্যা। আপনি নিশ্চয় ঐ বিদ্যাটা জানেন আর তাই দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ ॥ ঠিক উল্টো কথাটি বললি রে নরেন।

নরেন ॥ কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ আরে, মানুষ সংসারে এসে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে থাকে—আসল সত্যিটা দেখতে পায় না। আমি তোর সেই মুগ্ধ-ভাবটা কিছুক্ষণের জন্যে নষ্ট করে দিয়ে আসল সত্যিটা দেখিয়ে দিলুম।

নরেন ॥ কি জানি, আপনি কি বলেন, কিছুই বুঝতে পারি না।

রামকৃষ্ণ ॥ পারবি, পারবি, আস্তে আস্তে পারবি। তুই ছাড়া আর কে বুঝবে বল্?

[পর্দা পড়ে]

দ্বিতীয় অংক

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। সাতদিন পর। অপরাহ্ণ। রামকৃষ্ণদেব বিছানায় বসে আছেন। বিবেকানন্দের প্রবেশ]

রামকৃষ্ণ ॥ কি ব্যাপার, এবার যে বড্ড তাড়াতাড়ি আগমন হল গো! কি মনে করে?

নরেন ॥ কিছু মনেটনে করে আসিনি। হাতে কাজ নেই, তাই ভাবলাম যাই একবার দক্ষিণেশ্বর—

রামকৃষ্ণ ॥ কলকাতায় যাবার জায়গা ত কত আছে। সব ছেড়ে তবে দক্ষিণেশ্বরে কেন?

নরেন ॥ আপনি কি ভেবেছেন আপনার মা কালীর ওপর আমার বিশ্বাস এসে গেছে?

রামকৃষ্ণ ॥ হা-হা হা-হা—অবিশ্বাস করবি বলে তুই যেন কোমর বেঁধে লেগেছিস্, হ্যাঁরে? যাক্, তুই সেদিন বাপু আমায় বড্ড বাজে কথা বলে গেছিলি।

নরেন ॥ কোন কথা?

রামকৃষ্ণ ॥ ঐ যে, আমি একটা ব্যামোতে ভুগছি।

নরেন ॥ কি করে বুঝলেন আমার কথা বাজে?

রামকৃষ্ণ ॥ আমি মাকে কেঁদে কেঁদে জিগেস করলুম—

নরেন ॥ আর মা এসে আপনাকে বলে গেল—

রামকৃষ্ণ ॥ ঠিক তাই। মা আরো কি বললে জানিস ?

নরেন ॥ কি ?

রামকৃষ্ণ ॥ বললে তুইও নাকি মাকে খুব ভালবাসিস।

নরেন ॥ আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ্, তোর অবিশ্বাসটা হচ্ছে ওপরের আবরণ। ওটা দুদিনে খসে যাবে।

নরেন ॥ হা-হা-হা—আপনার কথা শুনলে হাসি পায়।

রামকৃষ্ণ ॥ হাসির কি বললাম রে। তুই কি ভগবানকে পেতে চাস্ না।

নরেন ॥ আপনার মা কালী ত আর ভগবান নয়।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই মায়ের মহা দুষ্ট, ছেলেরে, বুঝলি ? ছোট ছেলে-পুলেরা কি করে দেখিস না ? মায়ের ওপর রাগ করে কেঁদে কেঁদে মায়ের কোলেই মুখ লুকোয়।

নরেন ॥ আপনার সংগে কথায় আঁটা মুস্কিল।

রামকৃষ্ণ ॥ কি করে পারবি রে। স্বয়ং মা যে আমার মুখে কথা জোগায়। আয়, একবার আমার কাছে আয় ত—

নরেন ॥ কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ আয় না বলছি।

নরেন ॥ এই ত এসেছি। বলুন। (রামকৃষ্ণদেব নরেনের মাথায় একবার হাত রাখেন) একি হল। একি। আবার যে সে রকম হল। উঃ কি ভয়ংকর। সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, উল্কাপিণ্ড যেন—ঘুরতে—ঘুরতে—ঘুরতে—

[নরেনের সমাধি হয়। সে স্থির হয়ে বসে]

রামকৃষ্ণ ॥ (খুশিতে) কিরে, অ্যাঁ? বড় যে অবিশ্বাস করিস আমায়! কেমন হল এবার? বাছাধনের মুখে আর রা-টি নেই। কেমন চমৎকার সমাধি হয়েছে! যাক্, যা জানবার ওর মুখ থেকেই জেনে নিই। (খানিকটা নাটকীয় সুরে) তুই কে রে?

নরেন ॥ (যেন স্বপ্নের দেশ থেকে কথা ভেসে আসে) পরমাত্মার যে অংশ বিশুদ্ধ পৌরুষ আর প্রেম—আমি তাই।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই পৃথিবীতে কেন এসেছিস?

নরেন ॥ মানুষের ক্লীবত্ব ঘোচাতে—মাভৈ মন্ত্রে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে—তারা যে অমৃতের সন্তান সে কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই তাহলে মানুষের দুঃখ ঘোচাতে এসেছিস্?

নরেন ॥ দুঃখটা যে একটা মিথ্যে প্রহেলিকা সেই কথাটা জানিয়ে দিতে এসেছি।

রামকৃষ্ণ ॥ কি করে জানাবি?

নরেন ॥ তুমি আমায় শক্তি দেবে আর সেই শক্তি বাণী হয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরোবে।

রামকৃষ্ণ ॥ পৃথিবীটা যে অনেক বড় রে! কটা লোককে শোনাবি তোর কথা?

নরেন ॥ সত্য বাণী হচ্ছে বিদ্যুতের মত—জন্ম হওয়া মাত্র সে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব।

রামকৃষ্ণ ॥ তোর ঘর সংসার ?

নরেন ॥ ঘর সংসার আমি করব না।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই কি তাহলে সন্নিসি হবি ?

নরেন ॥ নিশ্চয়।

রামকৃষ্ণ ॥ এ-ত বড় বিপদ হল রে !

নরেন ॥ কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ নিজে সন্নিসি হয়ে তুই ত সকলকে সন্ন্যাস নেবার পরামর্শ দিবি। দেশে দেশে কতগুলো নিষ্প্রাণ সন্নিসির সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি ?

নরেন ॥ আপনার সন্দেহ মিথ্যে।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে তুই কি বলবি লোককে ?

নরেন ॥ আমি তাদের বলব এক নতুন কথা। ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, পেশা ছেড়ে সবাই সন্ন্যাসী হও—এ কথা আমি তাদের বলব না। আমি বলব—যে যেখানে আছো সেইখা'নেই থাক। যে যে কাজ করছ সেই কাজই কর। শুধু তোমারা তেজস্বী হও, নির্ভীক হও, বীর্যবান হও, সকলকে ভালবাস আর ভগবানে বিশ্বাস কর। দারিদ্র্য এলে তাকে অগ্রাহ্য কর, বিপদ এলে তাকে অগ্রাহ্য কর, শোক দুঃখ যন্ত্রণা যা-ই আসুক সকলকে অগ্রাহ্য কর—দেখবে, তোমার আত্মা জাগ্রত হয়েছে—তুমি অপরাজেয় —তোমার অন্তরে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আনন্দ থেকে সৃষ্টি, আনন্দেই এর স্থিতি

আবার আনন্দেই এর লয়। সেই এক পরমাত্মায় আত্ম-সমর্পন কর—সর্বভূতে যাঁর প্রকাশ। তাই সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হও—সর্বভূতের যিনি কেন্দ্র স্বরূপ—যিনি সমস্ত কারণের কারণ—হৃদয়ে তাঁকে উপলব্ধি কর—আর এটা করতে পারলেই দেখবে ভয় তোমার পদানত—হতাশা তোমার পদানত—দারিদ্র্য তোমার পদানত—আর জীবনের যত রকম দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আছে সব তোমার পদানত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ ॥ আহা, আহা, তুই কি কথা শোনালি! আলো, আলো, চারদিকে শুধু আলোর বান ডেকেছে—যত অন্ধকার ছিল সব কোথায় পালাল?

নরেন ॥ (সমাধি ভেঙে যায়) এ আমি কোথায় এসেছি!

রামকৃষ্ণ ॥ কেন রে, বুঝতে পারছিস না? তুই ত দক্ষিণেশ্বরে এসেছিস্।

নরেন ॥ কি করে এলাম? কার সংগে?

রামকৃষ্ণ ॥ তুই নিজেই এসেছিস—হেঁটে হেঁটে—

নরেন ॥ এতক্ষণ আমি কোথায় ছিলাম?

রামকৃষ্ণ ॥ এইখানেইত।

নরেন ॥ আমি কি তাহলে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম?

রামকৃষ্ণ ॥ স্বপ্ন নয়, মহা সত্যের ছবি।

নরেন ॥ এ সব কি বলছেন আপনি?

রামকৃষ্ণ ॥ সে কথা এখন বুঝবি না।, পরে বুঝবি। খাবি? খিদে পেয়েছে?

নরেন ॥ না।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে কি করবি?

নরেন ॥ আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে— আমি একটু ঘুমোব।

রামকৃষ্ণ ॥ তাই কর্। এই নে—এই বালিশটা নে। (বালিশ দেন) এইখানে শুয়ে পড়—

[নরেন বালিশে মাথা রেখে রামকৃষ্ণের চৌকিতে শুয়ে পড়ে]

ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে।

দ্বিতীয় অংক

চতুর্থ দৃশ্য

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। কয়েকদিন পর। সময় সকাল। নরেনের প্রবেশ। তার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা।]

নরেন ॥ ওরে প্লেটো, ও প্লেটো। কি রে বাবা, সব গেল কোথায়? (জোরে ডাকে) ওরে ও প্লেটো—

[লাটুর প্রবেশ]

লাটু ॥ কিগো দাঠাকুর, তুমি কখন এলে?

নরেন ॥ এই মাত্র। হাজরা কোথায়?

লাটু ॥ বাগানে বসে আছে।

নরেন ॥ তোদের বাবাঠাকুরকে দেখছিনা যে?

লাটু ॥ বাবাঠাকুর মন্দিরে। তোমার হাতে ও ঠোঙায় কি গো দাঠাকুর?

নরেন ॥ বল্ দেখি কি?

লাটু ॥ বুঝতে পারছি না।

নরেন ॥ পাঁঠার মাংস।

লাটু ॥ অ্যাঁ!

নরেন ॥ কি রে, ভূত দেখলি নাকি?

লাটু ॥ মাংস এনেছ কেন গো?

নরেন ॥ খাবো। নে—খুব ভাল করে রাঁধ দেখি। আজ দম ভোর খেতে হবে।

লাটু ॥ সর্বনাশ। ও আমি রাঁধতে পারবো না।

নরেন ॥ কেন?

লাটু ॥ বাবাঠাকুর তাহলে আর আস্ত রাখবে না।

নরেন ॥ বাবাঠাকুর ত আর খাবে না। খাব ত আমি।

লাটু ॥ এইখানে মাংস খাবে? খেপেছ? বাবাঠাকুরের নাকে গন্ধ গেলে বমি করে ফেলবে। একবার হাজরা যেন কোত্থেকে মাংস খেয়ে এসেছিল। বাবাঠাকুর তাকে মারতে বাকি রেখেছিল।

নরেন ॥ এত বড অন্যায় কথা। আমি কি ওঁর মত সাধু যে ফলমূল খেয়ে কাটাবো?

[হাজরার প্রবেশ]

এই যে হাজরা। মাংস খাবে?

হাজরা ॥ মাংস? আঃ নিশ্চয় খাব।

নরেন ॥ বেশ, তাহলে রান্না চাপাও। এই নাও।

হাজরা ॥ রান্না করে খেতে হবে? এইখানে? আমি ভাবলাম কোথাও নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে বুঝি।

নরেন ॥ এখানে খেলে দোষ কি?

হাজরা ॥ দোষ নয়, তবে ঠাকুর রয়েছেন যে—

নরেন ॥ তুত্তোরি ঠাকুরের নিকুচি করেছে। আরে ঠাকুরইত বলেন সব জিনিসে ঈশ্বর আছেন। তাহলে এই মাংসর মধ্যেও ত তিনি আছেন। তবে আর এ খাদ্যটা খারাপ কেন? নাও, চাপাও রান্না—

হাজরা ॥ দেখ দাঠাকুর—

নরেন ॥ বুঝেছি, তুমিও পারবে না। ঠিক আছে আমি নিজেই রাধব — [প্রস্থান]

লাটু ॥ দাঠাকুর।

হাজরা ॥ ও দাঠাকুর।

লাটু ॥ অমন কাজ করো না, শোনো—

নরেন ॥ (নেপথ্যে) তোদের কারোর কথা আমি শুনবনা।

হাজরা ॥ কি সব্বোনাশ হবেরে লেটো—

[এক চুবড়ি খাবার হাতে লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর প্রবেশ]

হাজরা ॥ আসুন, আসুন, লক্ষ্মীনারায়ণজী—সকাল বেলা কি মনে করে ?

লক্ষ্মী ॥ আরে ভাই ভগোয়ান দর্শন করতে আসব তা সোকাল অর রাত কি আছে। লাও, ধরো।

হাজরা ॥ (হাজরা আর লাটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে) এসব আবার কেন ?

লক্ষ্মী ॥ কি যে বোলো হাজরা, ভগোয়ান দর্শন করতে আসবে, তা হাথে করে কুছু লিয়ে আসবে না ?

হাজরা ॥ ঠাকুর এসব পছন্দ করেন না।

লক্ষ্মী ॥ আরে বাবা, কুছু লিয়ে এলে হামি ত শান্তি পায়। লাও, ধরো—

[হাজরা চ্যাঙাড়িটা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের তাকে রাখে। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির থেকে ফিরে আসেন।]

লক্ষ্মী ॥ (সাস্টাংগে প্রণাম করে) পরনাম বাবাঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ একি প্রণামের ঘটা ! ওঠো, ওঠো।

লক্ষ্মী ॥ হামার উপুর একটু দয়া রাখবেন ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ তুমি আমার কাছে কি চাও বল ত ?

লক্ষ্মী ॥ কুছু চায়না—মানে—হামার কারবারঠো ভালো চলছে না।

রামকৃষ্ণ ॥ তা আমি কি মন্তর দিয়ে তোমার কারবারটা চালিয়ে দেব ?

লক্ষ্মী ॥ আপনার দয়া হলে কি না হোয়—

রামকৃষ্ণ ॥ তুমি তাহলে এই জন্যেই আমার কাছে আস ?

লক্ষ্মী ॥ আরে রাম, রাম, হামি আসে ভগোয়ান দর্শন করতে।

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ, আমার কাছে না এসে একজন ধনী মহাজনের কাছে যাও। আমি গরীব বামুন, টাকা কোথায় পাব ?

লক্ষ্মী ॥ আপনি হামাকে বিশোয়াস করেন না বাবাঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ যাও, যাও, আমায় আর জ্বালিয়োনা বাপু।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, আচ্ছা, আজ হামি যাচ্ছে, তবে হামি ফিন আসবে। [প্রস্থান]

রামকৃষ্ণ ॥ হাঁরে হাজরা, তুই ঐ মাড়োয়ারিটার সংগে জমাচ্ছিলি বুঝি ?

হাজরা ॥ আজ্ঞে না—

রামকৃষ্ণ ॥ ওসব ছাড়্, ছাড়্। হ্যাংলা হলে কিচ্ছু পাওয়া যায় না জানবি। (একটু থেমে) হ্যাঁরে হাজরা, কিসের একটা

গন্ধ পাচ্ছিরে ? (হাজরা আর লাটু চোখ চাওয়া চাওয়ি করে।) বলছিস না কেন ? (হাওয়া থেকে ঘ্রাণ নেন) আরে, এ-যে দেখছি মাংসের গন্ধ ! অ্যা ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ মাংস খাওয়া কিরে ! হ্যাঁরে হাজরা ! শালা বোবা বনে গেলি নাকি ?

[সহসা নরেনের প্রবেশ]

নরেন ॥ ওরে ও লেটো, শিগগির বাজার থেকে দু আনার পেঁয়াজ এনে দে—শিগ্—

[রামকৃষ্ণকে দেখে থমকে যান]

রামকৃষ্ণ ॥ (উৎফুল্ল হয়ে) আরে ! নরেন এসেছিস্ ! কি আশ্চর্য ! এতক্ষণ তোরা আমায় বলিসনি ? তোরা শালারা একেবারে হাড় পাজি দেখছি। তা হাঁরে নরেন, আজ বুঝি মাংস রাঁধবি ? বেশ—বেশ—জোরসে লাগা। (সকলে বিস্ময়ে অবাক) আমি এক্ষুণি বাজার থেকে প্যাঁজ আনিয়ে দিচ্ছি। যা—যা নরেন—তুই যা—রান্নার জোগাড় করগে যা—তা নাহলে আবার খেতে বেলা হয়ে যাবে।

[নরেনের প্রস্থান]

রামকৃষ্ণ ॥ লেটো, তুই এক ছুটে বাজার থেকে দু' আনার প্যাঁজ এনে দে ত। আর হাজরা, তুই রান্নার ব্যাপারে নরেনের সংগে হাত লাগাগে যা। ওঃ বেটার নোলা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ! যা লেটো আর দেরি করিস নি।

লাটু ॥ খাবারের চ্যাঙাড়িটা নিয়ে যাই।

রামকৃষ্ণ ॥ খাবারের চ্যাঙাড়ি মানে ?

লাটু ॥ লক্ষ্মীনারাণ মাড়োয়ারি এক চ্যাঙাড়ি খাবার দিয়ে গেছে যে—

রামকৃষ্ণ ॥ (তাকের ওপর চ্যাঙাড়িটার দিকে তাকিয়ে) ওরে বেটা! তা চ্যাঙাড়িটা কোথায় নিয়ে যাবি ?

লাটু ॥ কেন, গংগায় ফেলে দিতে।

রামকৃষ্ণ ॥ বেটা মুখ্যু, ফেলে দিবি কেন ?

হাজরা ॥ ফেলব না ? আমরা খাব ?

রামকৃষ্ণ ॥ থাম্ শালা আহাম্মক। তোর ত বড্ড নোলা দেখছিরে, অ্যাঁ ? যা লেটো, সব খাবারগুলো নরেনকে দিয়ে দে। এখন পেট পুরে মিষ্টি খেয়ে নিক্। ওর খেলে দোষ নেই। ও হচ্ছে পবিত্র পাবক—সর্বদহ—সবসহ। যা, যা, আর দেরি করিস নি।

[খাবারের চ্যাঙাড়িটা লাটু তাক থেকে তুলে নেন। হাজরা ও লাটু প্রস্থানোদ্যত।]

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ শোন—

[দুজনেই ফেরে।]

তোরা কিন্তু একটা মিষ্টিও খাসনি, বুঝলি ? যা—

[উভয়ের প্রস্থান।]

পর্দা পড়ে

দ্বিতীয় অংক

পঞ্চম দৃশ্য

[পর্দা উঠবার আগে মাইক্রোফোনে ঘোষণা জাগে ঃ

"তারপর একদিন এল সেই কালরাত্রি। বরানগরে এক বন্ধুর বাড়িতে নরেন তখন গানের জলসায় মত্ত। রাত বারোটা বেজে গেছে। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত নরেনের বাড়ি থেকে একজন লোক এসে মর্মঘাতী সংবাদ দিয়ে গেল—নরেনের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্তব্ধতার এক শোকাবহ সমুদ্রে ডুবে গেল সেই মুখর সংগীত সভা। নরেনের বুকে যেন শেল বিঁধল। ছুটে চলল সে বাড়িতে। বাবা ত তেমন অসুস্থ ছিলেন না। তবে কি আর নরেন আসত এই গানের জলসায়? বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পেল না। এ কি দুর্দৈব নেমে এল তার জীবনে!

তারপরের ইতিহাস বড় করুণ, বড় নিষ্ঠুর। বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন পরিবারের স্তম্ভ স্বরূপ। অর্থ উপার্জন করতেন প্রচুর; ব্যয় করতেন ততোধিক। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল সেই স্তম্ভ একেবারে ধসে গেছে। জমানো অর্থ কিছুই নেই। উপরন্তু দেনা। তাছাড়া যা ছিল তাও যেতে বসল জটিল মামলা মোকদ্দমায়। নরেন ত সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। উপার্জনের কোন রাস্তাই তার কাছে তখন সহজলভ্য নয়। এতবড় সংসারের ভরণপোষণ কে চালাবে?

নরেন প্রমাদ গুনল। দরজায় দরজায় সে ঘুরতে লাগল একটা চাকরির সন্ধানে। কিন্তু কে দেবে চাকরি? সমাজ বড় নির্মম, পৃথিবী বড় উদাসীন। কারও দুঃখের দিকে এরা তাকায় না। ভাই বোন আর মায়ের দুঃখে নরেন হয়ে উঠল উদভ্রান্ত। তার পৌরুষ, তার আত্মবিশ্বাস যেন ভেঙে পড়তে চাইল।

জীবিকার ক্লেদাক্ত ঝড় ঝরিয়ে দিতে চাইল জীবনের উজ্জ্বল শতদলকে। নিদারুণ হতাশায় সে হল মুহ্যমান।

নরেন দক্ষিণেশ্বরের কথা ভুলে গেল। ভুলে গেল ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। মাসের পর মাস কেটে গেল, তবু সে গেল না দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।"

ধীরে ধীরে পর্দা ওঠে। পূর্বোক্ত দৃশ্য।]

রামকৃষ্ণ ॥ এ সব তুই কি বলছিস রে হাজরা ?

হাজরা ॥ ঠিকই বলছি।

রামকৃষ্ণ ॥ নরেন খারাপ হয়ে গেছে ? বদ সংগে মিশছে ? ওকালতি করবার ব্যবস্থা করছে ?

হাজরা ॥ সব সত্যি।

রামকৃষ্ণ ॥ কার কাছে শুনলি ?

হাজরা ॥ কেন, সবাই বলছে। অতুলবাবু, কালিবাবু, নিরঞ্জনবাবু—সবাই।

রামকৃষ্ণ ॥ না, না, না, এ হয় না—এ হয় না।

হাজরা ॥ আপনি ওকে চিরকালই অন্য চোখে দেখেন। তাই আপনি এখন সত্যিটাও বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই থাম্।

হাজরা ॥ আপনি জিগ্যেস করলেন তাই বললুম।

রামকৃষ্ণ ॥ যা, একবার লেটোকে পাঠিয়ে দে।

হাজরা ॥ দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

রামকৃষ্ণ ॥ নরেন খারাপ হয়ে গেছে? (যেন হাওয়াকে জিগ্যেস করেন) মা, এ কথা সত্যি? বল্, বল্ মা, এ কথা সত্যি?

[লাটুর প্রবেশ]

লাটু ॥ কি বলছ গো বাবাঠাকুর?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ রে লেটো, নরেন নাকি খারাপ হয়ে গেছে? বদ সংগে মিশছে? সবাই নাকি বলছে এ কথা?

লাটু ॥ বাজে লোকের কথায় কেন যে কান দাও। ওরা সব হিংসেয় বলে। লোরেন দাঠাকুরকে কি ওরা বুঝতে পারে? লোরেন দাঠাকুর হল সূয্যি। সূয্যি কোনদিন কালো হয়? কখনও কখনও পিথ্যিমির ছায়া পড়ে গেরন লাগলে কালো দেখায় বটে। সে অল্পক্ষণের জন্যে। তারপর আবার যেমনকে তেমন। বাপ মরার পর একটু কষ্টে পড়েছে। তাই দাঠাকুরের ওপর দিন কয়েকের জন্যে পিথ্যিমির ছায়া পড়েছে। ও ত দুদিন বাদেই সরে যাবে।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে, মহামায়া তোর মুখে ভর করেছে রে, মহামায়া তোর মুখে ভর করেছে। আয়, আয়, আমার বুকে আয়—

লাটু ॥ দূর, তোমার সংগে পাগলামি করার সময় নেই—আমার এখন অনেক কাজ—

[লাটুর প্রস্থান]

লাটু ॥ (নেপথ্যে) আরে, নোরেন দাঠাকুর যে! এতদিনে মনে পড়ল আমাদের?

রামকৃষ্ণ ॥ (উচ্ছ্বসিত হয়ে) ওরে! কে এসেছে রে? কে এসেছে, অ্যাঁ? নরেন? নরেন এসেছে নাকি রে?

[নরেন ও লাটুর প্রবেশ]

লাটু ॥ এইমাত্র তোমার কথা হচ্ছিল গো দাঠাকুর। ইস্, তোমার চেহারাটা কি খারাপ হয়ে গেছে গো! কিন্তু তোমার চোখ দুটো তেমনি আছে। বরং আরো আলো ফুটেছে।

নরেন ॥ দূর! চাকরি খুঁজে খুঁজে চোখে অন্ধকার দেখছি। (রামকৃষ্ণকে) মা ত আপনার কথা শোনে। তাকে বলে, দিন না আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে।

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ নরেন্, মায়ের কাছে আমি ত কখনও সামান্য টাকা পয়সা চাইনি—আর চাইতেও পারব না। তার চেয়ে এক কাজ কর। তুই বরং নিজে গিয়ে মাকে বল্।

নরেন ॥ আমার কথা কি আর মা শুনবে?

রামকৃষ্ণ ॥ শুনবে, শুনবে। মা সকলের কথা শোনে! মা যে জগৎজননী।

নরেন ॥ কিন্তু আমি ত আপনার মাকে বিশ্বাস করি না।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই তোর অবিশ্বাস নিয়েই যা না।

নরেন ॥ ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, তখন একবার বলে দেখি—

[নরেনের প্রস্থান]

লাটু ॥ বুঝলে বাবাঠাকুর, এবার বোধহয় মায়ের ওপর দাঠাকুরের বিশ্বাস হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ বিশ্বাস ওর ছিলনা কবে ?

লাটু ॥ বিশ্বাস ছিল কোথায় গো! তোমার সংগে কত উল্টো তক্কো করেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ ও সব বিশ্বাসেরই ফল। তর্ক করে জিনিসটাকে পাকিয়ে নিয়েছে।

লাটু ॥ কি জানি বাবাঠাকুর তোমার কথা আমরা বুঝি না।

[নরেনের প্রবেশ]

নরেন ॥ না, না, চাকরির কথা আমি মাকে বলতে পারব না।

রামকৃষ্ণ ॥ সেকিরে! কিছু না বলে চলে এলি ?

নরেন ॥ হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই ত আচ্ছাই বোকা দেখছি। যা, যা, আবার যা। মনে জোর এনে বলে ফেল কথাটা। যা—

নরেন ॥ যাব ?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

[নরেনের প্রস্থান]

রামকৃষ্ণ ॥ লেটো, দেখছিস মজা ?

লাটু ॥ ওকে নিয়ে তুমি কি খেলা খেলছ বাবাঠাকুর ?

রামকৃষ্ণ ॥ আমি খেলছি নারে। মা বেটি খেলছে।

লাটু ॥ এবার কি দাঠাকুর মাকে চাকরির কথা বলবে ?

রামকৃষ্ণ ॥ দেখনা, কেমন রগড় হয়।

লাটু ॥ তোমার মনে কি আছে কে জানে ঠাকুর। তবে দাঠাকুরের জন্যে কষ্ট হয়। বড় দুঃখে পড়েছে।

রামকৃষ্ণ ॥ ভালইত হয়েছে।

লাটু ॥ দুঃখটা ভাল কি গো।

রামকৃষ্ণ ॥ ভাল না? দুঃখটা হচ্ছে শোধন, বিষাদ যোগ। পূর্ণজ্ঞান পাবার আগে অর্জ্জুনের হয়েছিল, এটা দরকার।

[নরেনের প্রবেশ]

রামকৃষ্ণ ॥ কিরে, এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?

নরেন ॥ দূর, আমি চাইতে পারব না।

রামকৃষ্ণ ॥ এবারও চাকরির কথা না বলে চলে এলি নাকি?

নরেন ॥ হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই সত্যিই বড় বেহিসেবী।

নরেন ॥ যাক গে, হিসেব করে আমার আর দরকার নেই। আপনি যখন চাইতে পারবেন না, তখন আমিই বা কেন মুখ নষ্ট করি!

রামকৃষ্ণ ॥ মুখ নষ্ট কিরে। চাকরি ত তোরই দরকার। আচ্ছা, আর একবার যা তুই। এবার ঠিক বলতে পারবি।

নরেন ॥ না, আমি আর যাব না।

রামকৃষ্ণ ॥ আচ্ছা, এই শেষ বার। এবার যদি বলতে না পারিস। তবে আর যেতে হবে না।

[নরেনের প্রস্থান]

লাটু ॥ তোমার কি মতলব বল ত বাবাঠাকুর?

রামকৃষ্ণ ॥ দেখনা, কেমন নাটক হবে এক্ষুনি।

লাটু ॥ নাটক কি গো !

রামকৃষ্ণ ॥ যা ভাবতে পারিস না তা যদি হঠাৎ ঘটে যায়, তবে নাটকের মত মনে হয় নাকি ?

লাটু ॥ তা ত হয়।

রামকৃষ্ণ ॥ সেই রকমই একটা ঘটনা ঘটবে এবার।

লাটু ॥ দাঠাকুরকে মা বুঝি খুব বড় চাকরি করে দেবে ?

রামকৃষ্ণ ॥ প্রকাণ্ড চাকরি। এমন চাকরি কেউ পায় না।

লাটু ॥ কত মাইনে পাবে ? জজ ম্যাজিস্টরের চেয়েও বেশি ?

রামকৃষ্ণ ॥ অনেক, অনেক বেশি। মাইনে মুক্তি।

লাটু ॥ সে আবার কি গো ?

রামকৃষ্ণ ॥ এক্ষুণি টের পাবি সেটা কি।

[দ্রুতবেগে নরেন প্রবেশ ক'রে রামকৃষ্ণঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে]

নরেন ॥ আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন ঠাকুর, আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন। আমি এবার মায়ের কাছে চেয়েছি। মা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ কি চাইলি রে ?

নরেন ॥ চেয়েছি জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য আর ভক্তি।

রামকৃষ্ণ ॥ টাকা পয়সা চাইলি না ?

নরেন ॥ আর আপনি আমার সংগে ছলনা করবেন না ঠাকুর। আমাকে আপনার চরণে স্থান দিন।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে ওঠ্, ওঠ্। তুই আমার বুকে আয়।

[দুজনে আলিংগনাবদ্ধ হয়। লাটু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।]

পর্দা পড়ে

দ্বিতীয় অংক

ষষ্ঠ দৃশ্য

[পর্দা উঠবার আগে মাইক্রোফোনে ঘোষকের কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে: "শিষ্যদের হৃদয়ে স্তব্ধ কান্নার আবেগ। নরেনের স্নানাহার বন্ধ। শ্রীশ্রীঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। মহেন্দ্র ডাক্তার বলেছে 'ক্যানসার।' অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছেন ঠাকুর। তিনি কি এবার সকলকে ছেড়ে চলে যাবেন? জগতের লীলা কি তাঁর শেষ হয়েছে? মহেন্দ্র ডাক্তার, গিরীশ ঘোষ, নিরঞ্জন, অতুল, কালিপ্রসাদ—সবাই তাঁকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু লোকজন দেখলেই ঠাকুর খালি কথা বলেন। মহেন্দ্র ডাক্তার তাই সবাইকে নিয়ে চলে গেল। হাজরাকে বলে গেল সন্ধ্যের পর ঠাকুরকে সুজির পায়েস খাইয়ে দিতে।"

ধীরে ধীরে পর্দা ওঠে। পূর্বোক্ত দৃশ্য। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বিছানায় বসে আছেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ (গান গেয়ে ওঠেন) দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।

[হাজরা ও লাটুর প্রবেশ। হাজরার হাতে সুজির পায়েসের বাটি।]

লাটু ॥ আবার গান গাইছ বাবাঠাকুর? ডাক্তারবাবু যে বারণ করে গেছে।

হাজরা ॥ পায়েসটা খেয়ে নিন বাবাঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ এর মধ্যে আনলি?

হাজরা ॥ সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁরে লেটো, নরেন আসেনি ?

লাটু ॥ আসবে, আসবে।

হাজরা ॥ দা ঠাকুর ত বাড়িতে যেতেই চায় না। আমরা জোর করে পাঠিয়ে দিই।

রামকৃষ্ণ ॥ ভালই করিস।

হাজরা ॥ নিন্। এবার খান—

[রামকৃষ্ণ ঠাকুর খেতে আরম্ভ করেন। বেশ খানিকটা খাবার পর প্রচণ্ড কাসি ওঠে। গলা দিয়ে রক্ত বেরোয়]

হাজরা ॥ কি হল ? কি হল ঠাকুর ? একি ! এ যে রক্ত !

লাটু ॥ থাক্, থাক্, আর খেয়ে কাজ নেই।

হাজরা ॥ পাখা দিয়ে হাওয়া কর লাটু। সব বমি হয়ে গেল। রক্ত বমি।

[লাটু পাখা এনে বাতাস করে। হাজরা রামকৃষ্ণের মুখের সামনে বাটিটা ধরে। সেই বাটিতে রক্তবমি হয়। ঠাকুর একটু শান্ত হলে বাটিটা হাজরা ঘরের একপাশে রেখে দেয়। রামকৃষ্ণ ঠাকুর এবার ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ঘুম আসে। নরেন প্রবেশ করে।]

নরেন ॥ কি রে লেটো, ঠাকুর কেমন আছেন ?

লাটু ॥ ভাল নেই গো দা ঠাকুর।

নরেন ॥ কেন রে, কি হল ?

লাটু ॥ এই দেখ না, গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

নরেন ॥ হাজরা, ঠাকুরকে সুজির পায়েস দিয়েছিলে ?

হাজরা ॥ সেটা খাওয়াতে গিয়েই ত ফ্যাসাদ।

নরেন ॥ খায়নি ?

হাজরা ॥ খেয়েছিল ত। কিন্তু সব রক্ত বমি হয়ে বেরিয়ে গেল।

নরেন ॥ মহেন্দ্র ডাক্তার এসেছিল ?

লাটু ॥ হ্যাঁ, দেখে গেছেন।

হাজরা ॥ তোমরা ত বল উনি ভগবান। তবে এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন ?

নরেন ॥ নরদেহ নিয়ে জন্মালে ভগবানকেও যে কষ্ট পেতে হয় রে। শ্রীরামচন্দ্র কষ্ট পান নি ?

হাজরা ॥ গলায় রোগ ঢুকিয়ে কষ্ট পাবার দরকার কি।

নরেন ॥ দেহের কষ্ট সবই এক।

হাজরা ॥ তোমায় দেখলে অবাক লাগে দা ঠাকুর।

নরেন ॥ কেন বল ত ?

হাজরা ॥ এতদিন তুমি ঠাকুরের সংগে কত তর্ক করেছ, আর আজ—

নরেন ॥ আজ আমি বুঝতে পেরেছি হাজরা—

হাজরা ॥ আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করব ?

নরেন ॥ করো না।

হাজরা ॥ তুমি ঠাকুরের সব কথা বিশ্বাস কর ?

নরেন ॥ সব।

হাজরা ॥ আচ্ছা, ঠাকুর যে বলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব বস্তু এক— জল, মাটি, সোনা, লোহা, পায়েস, বিষ্ঠা এ সবের মূলে কোন তফাৎ নেই—তা তুমি বিশ্বাস কর ?

নরেন ॥ করি।

হাজরা ॥ মনে প্রাণে বিশ্বাস কর?

নরেন ॥ নিশ্চয়। কিন্তু এত জেরা করছ কেন বল ত?

হাজরা ॥ তোমার বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে পারবে?

নরেন ॥ কেন পারব না।

হাজরা ॥ তবে, তবে ঐ বাটির সব রক্ত বমিটা খেয়ে ফেল দেখি।

লাটু ॥ এ সব তুমি কি বলছ গো হাজরা?

নরেন ॥ ঠাকুরের রক্তবমি? ঐ বাটিতে আছে? দে—দে—ও ত অমৃত।

[বাটিটা নিতে যায়]

লাটু ॥ (বাধা দেয়) না, না। অমন কাজ করোনা গো দা ঠাকুর, অমন কাজ করো না।

নরেন ॥ ছাড়্, ছাড়্, তুই মিথ্যে ভয় পাচ্ছিস্—

[লাটুকে ঠেলে সরিয়ে বাটিটা নরেন হাতে তুলে নেয়।]

লাটু ॥ তুমি কি পাগল হয়ে গেলে দা ঠাকুর? ও হাজরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এ কি সব্বোনেশে কথা বললে দা ঠাকুরকে? খেতে দিও না—দিও না—

হাজরা ॥ দা ঠাকুর, দা ঠাকুর, আমায় মাপ কর—তুমি খেও না—আমি প্রমাণ চাই না—

[দু হাতে বাটিটা ধরে নরেন তাতে দীর্ঘ চুমুক দেয়।]

লাটু ॥ একি সব্বোনাশ করছ! খেও না—খেও না—

হাজরা ॥ খেও না দা ঠাকুর, খেও না—তোমার পায়ে পড়ি—

[বাটির সমস্ত রক্তবমি নরেন পান করে ফেলে। তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।]

নরেন ॥ আঃ কি অপূর্ব।

হাজরা ॥ আমায় মাপ করগো দা ঠাকুর, আমি ঘোর পাপী। তোমায় সন্দেহ করেছিলুম।

নরেন ॥ তুমি আমার পরম উপকার করেছ হাজরা। তুমি আমার বন্ধু। সংশয়ের সমস্ত আবরণ আজ আমার সরে গেল। আচ্ছা, তোমরা এবার যাও।

[হাজরা ও লাটুর প্রস্থান। নরেন ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের শিয়রে বসে তার কপালে [illegible]]

রামকৃষ্ণ ॥ কে রে, নরেন এসেছিস্ বুঝি?

নরেন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ (উঠে বসেন) ভাল করেছিস্—

নরেন ॥ আপনি উঠছেন কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ তোর সংগে আমার কাজ আছেরে।

নরেন ॥ কি কাজ?

রামকৃষ্ণ ॥ তোকে আজ আমি মন্তর দেব।

নরেন ॥ মন্তর দেবেন? সত্যি?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি। আয়, আমার মুখের কাছে তোর কানটা নিয়ে আয়ত।

[নরেন এগিয়ে যায়। ঠাকুর তার কানে কানে কি যেন বলেন।]

নরেন ॥ (বিহ্বলভাবে) লোক শিক্ষা!

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁরে, এইটাইত তোর মন্তর।

নরেন ॥ এ মন্ত্রের সাধন করব কেমন করে?

রামকৃষ্ণ ॥ সারা দেশে ঘুরে বেড়াবি আর জীবনের মূল সত্যটা সকলকে বুঝিয়ে দিবি। আমাদের দেশটা বড় অসহায় হয়ে পড়েছে। বড় গ্লানি জমেছে জীবনে। সকলকে জাগাবি তেজে আর ভালবাসায়। শুধু কি আমাদের দেশ! তোর বাণী যাবে সাগর পেরিয়ে। প্রেমের মন্ত্রে ঐক্যের মন্ত্রে, মাভৈ মন্ত্রে বিশ্বের হৃদয় ভরে তুলবি। 'করে, পারবি না?

নরেন ॥ (ঠাকুরের পদধূলি নেয়) আপনার আশির্বাদ পেয়েছি, কেন পারব না।

রামকৃষ্ণ ॥ আঃ কি শান্তি! আজ আমার বডড ঘুম পাচ্ছেরে। আমি এবার ঘুমোই।

[ধীরে ধীরে শুয়ে পড়েন।]

পর্দা পড়ে

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা ওঠবার আগে মাইক্রোফোন মুখর হয়ে ওঠে: "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটে গেছে। তাঁর দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভাবনার সঞ্জীবনী সুর অনুরণিত হচ্ছে জাতীর প্রাণতন্ত্রীতে। তিনি রেখে গেছেন তাঁর মানসপুত্র নরেনকে—তাঁরই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য—তাঁরই শক্তি সঞ্চারিত করার জন্য—তাঁরই বাণী মানবের অন্তরে অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার জন্য। এক মহৎ আত্মিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে নরেন রূপান্তরিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দে। ভারতের দিকে দিকে বাণীর বিদ্যুৎ ছড়িয়ে তিনি এবার সত্যি এসেছেন সাত সমুদ্র পেরিয়ে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে।"

ধীরে ধীরে পর্দা ওঠে

আমেরিকায় শিকাগো শহরের এক প্রান্ত। একটা রেলওয়ে ইয়ার্ডের পাশে খানিকটা জমি। জমির পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। শীতকাল। একটু একটু বরফ পড়ছে। একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বিবেকানন্দ বসে রয়েছেন। তাঁর আকৃতি শান্ত সৌম্য। মাথায় একটা গেরুয়া পাগড়ি। পাশে একটা সুটকেস্। বিবেকানন্দ যেন একটু বিব্রত। জামার পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে তিনি কি যেন খুঁজছেন।]

বিবেক ॥ আশ্চর্য! কাগজ দুখানা যে কোথায় হারালুম! ভগবানের দয়ায় রাইট সাহেবের সংগে আলাপ হয়েছিল। কি বিরাট পণ্ডিত আর কি মহৎ প্রাণ! বোষ্টনে থাকতেই তিনি আমায় একটা পরিচয়পত্র দিলেন—

ধর্মমহাসভার ঠিকানা দিলেন—কিন্তু কাগজ দুটো খুঁজে পাচ্ছি না। কোথাও পড়ে গেছে নিশ্চয়। এই বিরাট শিকাগো শহরে আমি এখন যাই কোথায়? বোস্টনে ফিরে যাওয়াও আর সম্ভব নয়। বড় মুস্কিলেই পড়া গেল। যাক, ভগবান যখন এখানে এসেছেন, তখন তিনিই একটা ব্যবস্থা করবেন। তবে আশ্চর্য দেশ বটে এই আমেরিকা। ধর্মমহাসভার ঠিকানাটা কেউ বলতে পারল না। শিকাগোর কত লোককেত জিগ্যেস করলুম! কেউ জানে না। পৃথিবীতে এতবড় ধর্মসভা আর কোথাও কোনদিন হয়নি—প্রতিনিধি আসবে পঞ্চাশটারও বেশি দেশ থেকে। এই শহরে বসবে অধিবেশন অথচ এই শহরের লোকেরাই জানে না এ খবর। অবাক কাণ্ড! যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।—ঐ যে আর একজন ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন—ওকে একবার জিগ্যেস করে দেখি—শুনছেন? হ্যালো—মিস্টার—এই যে এদিকে—দয়া করে একটু শুনুন না—

[একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ভদ্রলোক ॥ আমায় ডাকছো?

বিবেক ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক ॥ দেখ বাপু, আমার কাছে পয়সা টয়সা হবে না।

[প্রস্থানোদ্যত]

বিবেক ॥ আজ্ঞে দয়া করে শুনুন— আমি ভিখিরি নই—

[ভদ্রলোক ফেরে]

ভদ্রলোক ॥ অ্যা! তুমি ভিখিরি নও?

বিবেক ॥ আজ্ঞে না।

ভদ্রলোক ॥ তুমি তাহলে কি চাও?

বিবেক ॥ আমি একটা ঠিকানা চাই।

ভদ্রলোক ॥ ঠিকানা! কিসের?

বিবেক ॥ বিশ্ব ধর্মসম্মেলন অফিসের।

ভদ্রলোক ॥ সেটা আবার কি জিনিশ হে! শিকাগো শহরে ও নামের কোন অফিস আছে বলেত আমার জানা নেই।

বিবেক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে—মানে—

ভদ্রলোক ॥ কিসের ব্যবসা ওদের?

বিবেক ॥ আজ্ঞে ব্যবসা নয়, ওটা একটা ধর্মসম্মেলন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের ধর্মীয় প্রতিনিধিরা এসে ঐ সম্মেলনে নিজেদের ধর্মের কথা বলবেন।

ভদ্রলোক ॥ যতসব পাগল লোকের কাণ্ড! তা, সেখানকার ঠিকানা তুমি চাইছ কেন?

বিবেক ॥ আজ্ঞে আমি যে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি।

ভদ্রলোক ॥ ভারতবর্ষ! হা হা হা- জোচ্চোর আর ভিখিরির দেশ?

বিবেক ॥ আজ্ঞে না সাধুসন্ত আর মহামানবের দেশ।

ভদ্রলোক ॥ তুমিও বোধ হয় একজন মহামানব?

বিবেক ॥ না, আমি এক মহামানবের সেবক।

ভদ্রলোক ॥ তোমার বুলি ত বেশ চোখা দেখছি। তা ওখানে ঐ যে—কি যেন বললে নামটা?

বিবেক ॥ বিশ্বধর্মসম্মেলন।

ভদ্রলোক ॥ হ্যাঁ, ঐ বিশ্বধর্মসম্মেলনে তুমিও বক্তৃতা দেবে নাকি ?

বিবেক ॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে দিতে পারি।

ভদ্রলোক ॥ তোমার নিজের কি ইচ্ছা ?

বিবেক ॥ আমার নিজের কিছু ইচ্ছা নেই। সবই তাঁর ইচ্ছা।

ভদ্রলোক ॥ এইটাই বোধ হয় প্রত্যেক ভারতবাসীর মূলতত্ত্ব ?

বিবেক ॥ হ্যাঁ। আর এইটা সমস্ত বিশ্ববাসীরই মূলতত্ত্ব হওয়া উচিত।

ভদ্রলোক ॥ সমস্ত বিশ্ববাসীর নয়, তোমার মত ভীতু আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের মূলতত্ত্ব তাই বটে।

বিবেক ॥ কুসংস্কার আমি ঘৃণা করি। আমি কাউকে ভয় করি না।

ভদ্রলোক ॥ ঈশ্বরকেও না ?

বিবেক ॥ ঈশ্বরকে আমি ভালবাসি। তাঁকে ভয় করার প্রয়োজন হয় না। যাক্। তর্ক করার জন্য আমায় মাপ করবেন। আপনি আমায় ঠিকানাটা দিতে পারবেন কি ?

ভদ্রলোক ॥ ওসব পাগলা গারদের ঠিকানা আমার জানা নেই। আচ্ছ, গুড্ বাই।

[প্রস্থান]

বিবেক ॥ নাঃ, ঠিকানা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ঠিক আছে, এইখানেই চুপচাপ বসে থাকবো যতক্ষণ না ঈশ্বর এসে পথ দেখিয়ে দেন।

[একটি দুটি করে কয়েকজন কৌতূহলী ছোকরা বিবেকানন্দের চারপাশে জুটতে থাকে। তাদের চোখে বিবেকানন্দ যেন এক অদ্ভুত জীব। তারা মোট তিনজন। দুজনের বয়স ষোল সতেরো। একজন রয়েছে একটু বেশি বয়সের। তার নাম জোনাথান। অন্য দুজনের নাম ষ্ট্যানলি আর রিচার্ড। বেশ বোঝা যায় জোনাথানই হল দলের সর্দার।]

বিবেক ॥ ভয় কি, তুমিত আছ ভগবান—আর তুমিইত আমাকে এদেশে এনেছ। তুমি যা করবার করবে। আমি কোন বিপদকে ভয় করি না। তুমিইত বিপদ হয়ে দেখা দাও। আঃ তোমায় স্মরণ করে কি আনন্দ! (সুর করে বলে)

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগঃ ভয়ঃ ক্রোধঃ স্থিথধীর্মুনিরুচ্যতে।

[ছেলেগুলোর দিকে বিবেকানন্দর নজর পড়ে।]

বিবেক ॥ কি বাবা চাঁদবদনেরা, কি চাও? সং দেখতে খুব মজা লাগ্‌ছে, না?

স্ট্যানলি ॥ তুমি কি বল্‌ছ?

বিবেক ॥ কি আর বল্‌ব বাবা, তোমাদের সংগে একটু রংগ করছি। (জোনাথানের দিকে) তোমাকেত বাবা দলের পাণ্ডা বলে মনে হচ্ছে। তবে তোমায় আমি ধর্ম-সম্মেলনের অফিসের ঠিকানা জিগ্যেস করব না। তুমি যে ওসবের ধার ধারো না, তা তোমায় দেখেই বুঝতে পারছি।

জোনাথান ॥ তুমি আমায় কিছু বলছ ?

বিবেক ॥ বলছিত বাবা তোমাকেই, কিন্তু—

জোনাথান ॥ তুমি কোন জাতের লোক ?

রিচার্ড। সেটা নিশ্চয় নিগ্রো।

স্ট্যানলি ॥ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

জোনাথান ॥ এই, তুমি নিগ্রো ?

বিবেক ॥ নিশ্চয়। দেখছ না, আমার গায়ের রং তোমাদের মত ফর্সা নয়।

রিচার্ড ॥ যাক্। অনেকদিন নিগ্রো পিটিয়ে হাতের সুখ করিনি—

স্ট্যানলি ॥ ঠিক বলেছ।

জোনাথান ॥ তুমি এখানে কি করছ ?

বিবেক ॥ চুপচাপ বসে আছি।

জোনাথান ॥ কেন ?

বিবেক ॥ কিছু করবার নেই বলে।

জোনাথান ॥ তোমার নিশ্চয় কোন বদ মতলব আছে।

বিবেক ॥ কিসে বুঝলে ?

রিচার্ড ॥ নিগ্রোরা যখন চুপচাপ বসে থাকে তখন তারা বদ মতলব না এঁটে পারে না।

বিবেক ॥ কিন্তু আমিত দেখছি বদ মতলব তোমাদেরই রয়েছে।

রিচার্ড ॥ তার মানে ?

বিবেক ॥ অনেকদিন নিগ্রো পিটিয়ে হাতের সুখ করিনি।

স্ট্যানলি ॥ বঝলে রিচার্ড, আমি জোর গলায় বলতে পারি, লোকটা কিছুতেই নিগ্রো নয়।

বিবেক ॥ এ আবার বলে কি গো!

জোনাথান ॥ ঠিক বলেছ স্ট্যানলি। আমারও তাই মনে হচ্ছে। (বিবেকানন্দকে) এই, সত্যি করে বল তুমি কে. কোথেকে এসেছ?

বিবেক ॥ আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি।

জোনাথান ॥ তুমি ভারতীয়?

বিবেক ॥ হ্যাঁ ভাই।

জোনাথান ॥ আমেরিকায় কি করতে এসেছ?

বিবেক ॥ তোমাদের শহরে যে বিশ্বধর্মসম্মেলন হবে তাতে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে এসেছি।

জোনাথান ॥ কি হবে?

বিবেক ॥ বিশ্বধর্মসম্মেলন।

জোনাথান ॥ সেটা আবার কি?

বিবেক ॥ তোমাদের এই শহরে একটা ধর্মসভা বসবে। সেখানে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসবে নিজের নিজের ধর্ম কথা বলতে।

রিচার্ড ॥ তা তুমি সেখানে কি করবে?

বিবেক ॥ আমি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চেষ্টা করবো।

স্ট্যান্‌লি ॥ হিন্দুদের আবার ধর্ম কি! তারাত বর্বর।

জোনাথান ॥ ঐ বর্বর ধর্মের কথা কে শুনতে চাইবে?

বিবেক ॥ সত্য কথা সবাই শুনতে চায়। আমি কি খ্রীস্টের কথা শুন্‌তে চাই না?

জোনাথান ॥ খ্রীস্টধর্ম হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

বিবেক ॥ সব ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কেন না সকলের মূল কথা এক।

জোনাথান ॥ ওবে স্ট্যানলি বেটা যে জ্ঞান দিচ্ছেবে।

স্ট্যানলি ॥ তাইত দেখ্‌ছি।

রিচার্ড ॥ আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে।

বিবেক ॥ তা দাও না বাবা, শিক্ষা নিতে আর দিতেইত এসেছি।

স্ট্যানলি ॥ ওহে, শুনছ ?

বিবেক ॥ বল।

স্ট্যানলি ॥ আমি বইতে পড়েছি পুরুষ সন্তান জন্ম দেবার পর হিন্দু রমনী তার শিশুকে নদীতে ছুড়ে ফেলে দেয়, এটা সত্যি ?

বিবেক ॥ খাঁটি সত্যি কথা।

রিচার্ড ॥ তোমার মা তোমাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল ?

বিবেক ॥ নিশ্চয়, তা না হলে আজ এখানে এলুম কি করে ?

স্ট্যানলি ॥ তার মানে ? কি বলতে চাইছ তুমি ?

বিবেক ॥ এটাও বুঝলে না ? দেখ, আমার মত একটা বর্বর জাতের লোক কি টিকিট কেটে জাহাজে চেপে আমেরিকায় আসতে পারে ? ভাগ্যিস মা আমায় নদীতে ফেলে দিয়েছিল। তাই তিরিশ বছর ধরে ভাসতে—ভাসতে—ভাসতে—ভাসতে—তোমাদের দেশে এসে গেছি—কি মজা বলত ?

রিচার্ড ॥ বুঝলে জোনাথান, লোকটা প্যাঁচের কথা বলে আমাদের ভীষন জব্দ করে ফেলছে—

জোনাথান ॥ আর এই তার পুরস্কার (বলেই সে বিবেকানন্দের নাকে একটা ঘুসি মারে।) রিচার্ড, স্ট্যানলি, মারো মারো বেটাকে--

রিচার্ড ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারো—

স্ট্যানলি ॥ মারো—(বিবেকানন্দকে তিন জনেই কিল চড় ঘুসি মারতে থাকে।)

বিবেক ॥ তোমরা সব কাওয়ার্ডস্, কাওয়ার্ডস্, হেটফুল কাওয়ার্ডস্—আচ্ছা, এবার তাহলে আমিও তোমাদের ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ভেবেছ সন্ন্যাসী দুর্বল। এসো তবে—(এবার বিবেকানন্দ যেন সিংহতেজে রুখে দাঁড়ায়। ফলে ওরা তিনজনেই ভয় পেয়ে যায়। ঠিক এই সময় একজন প্রৌঢ় আমেরিকান ভদ্রলোক প্রবেশ করেন। তার নাম মিস্টার হেল্।)

হেল ॥ কি ব্যাপার এখানে? একি! তোমরা ঐ লোকটার গায়ে হাত তুলছ কেন? দাঁড়াও, তোমাদের আমি পুলিশে দেব।

জোনাথান ॥ ওরে, পালিয়ে চল্।

[ছোকরা তিনজন ভয়ে পালিয়ে যায়।

হেল্ ॥ তুমি কে বাবা?

বিবেক ॥ আমি একজন ভারতীয়।

হেল্ ॥ তুমি কি সন্ন্যাসী?

বিবেক ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ঐ বিশেষ শব্দটা জানলেন কি করে?

হেল্ ॥ আমি ভারতীয় শাস্ত্র কিছু কিছু পড়েছি।

বিবেক ॥ একি অপূর্ব তোমার লীলা প্রভু!

হেল ॥ তুমি কোথায় থাক, মাই বয়।

বিবেক ॥ আমি বোস্টনে থাকতাম। একটু আগে শিকাগোয় এসেছি

হেল্ ॥ কেন?

বিবেক আমি বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবো।

হেল্ ॥ (আনন্দে দীপ্ত হয়ে) অ্যা! তুমি বিশ্বধর্মসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি? তা, এখানে ঘুরছো কেন?

বিবেক ॥ আমি বড় বিপদে পড়েছি! তবে, মনে হচ্ছে এবার বিপদ উদ্ধার হবে।

হেল্ ॥ কিন্তু বিপদটা কি?

বিবেক ॥ রাইট সাহেব আমায় একটা পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছিলেন। আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি।

হেল্ ॥ গ্রীক ভাষার অধ্যাপক রাইট্ সাহেব?

বিবেক ॥ আজ্ঞে হ্যা।

হেল ॥ কি আশ্চর্য! সে যে আমার বিশেষ বন্ধু।

বিবেক ॥ ধর্ম সভার অফিসের ঠিকানাটাও তিনি একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন। সেটাও আমি হারিয়েছি।

হেল্ ॥ তার জন্যে কোন চিন্তা নেই। আমি ধর্ম সভায় যাব। তোমার সব ব্যবস্থা আমিই করে দেব।

বিবেক ॥ আমার পরিচয় পত্রের কি হবে?

হেল্ ॥ সূর্যের কোন পরিচয় পত্র লাগে কি? সে যে স্বপ্রকাশ।

বিবেক ॥ আপনি মহানুভব। ঈশ্বর আপনাকে এখানে এনেছেন।

হেল॥ সত্যিই তাই। বিকেলে আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। এদিকে আসার কথা নয়, কিন্তু কেমন করে যে চলে এসেছি তা আমি নিজেও জানি না। তোমার নাম কি ইয়ংম্যান ?

বিবেক ॥ আমায় সকলে বিবেকানন্দ বলে।

হেল॥ দেখ, আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাই।

বিবেক ॥ আমার কাছে ভিক্ষে। এ আপনি কি বলছেন ?

হেল॥ সত্যি বল্‌ছি। এখানে যে সব ছেলেরা তোমার ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চাইছি।

বিবেক ॥ না, না, অমন কথা বলবেন না। বিশ্বাস করুন. ওদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ নেই।

হেল॥ ওদের জন্যে তুমি আমেরিকাকে ভুল বুঝবেনাত ?

বিবেক ॥ আপনার সংগে দেখা হবার পরও কি আমেরিকাকে ঠিক ভাবে বুঝবার যথেস্ট কারণ ঘটেনি ? কিন্তু আপনি কে ?

হেল্‌ ॥ আমার নাম মিস্টার হেল। বিশ্ব ধর্মসম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমিও একজন।

বিবেক ॥ আপনার সংগে দেখা হবার পরই আমি বুঝেছিলাম আপনি ঐ রকম কেউ হবেন। তাই এতক্ষন আপনার পরিচয় জিগ্যেস করিনি।

হেল্‌॥ এবারে আমাদের বাড়িতে চলো। আমার স্ত্রী মিসেস্‌ হেল তোমায় দেখলে খুব খুশি হবে।

বিবেক ॥ চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

পর্দা

তৃতীয় অংক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[করতালি ধ্বনির মধ্যে পর্দা ওঠে। শিকাগো শহরে 'ধর্ম মহাসম্মেলনের অধিবেশন বসেছে [illegible] গুরুগম্ভীর পরিবেশ। স্টেজের মধ্যে খানিকটা উঁচু বেদী। [illegible] উপবিষ্ট সভাপতি মিস্টার ব্যারোজ। তাঁর দু'পাশে নানা দেশের [illegible] প্রতিনিধিগণ বসে আছেন। এঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখা যাচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহের সামনের দুটি সারিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও অতিথিবর্গ। তারা যেন বিরাট সমাবেশের প্রতীক।]

ব্যারোজ ॥ (দাঁড়িয়ে) ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এতক্ষণ আপনারা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মিস্টার এইচ ধর্মপালের মূল্যবান ভাষণ শুনলেন। এবারে আপনাদের সামনে আমি একজন সন্ন্যাসীকে হাজির করব। ইনি ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ—

বিবেক ॥ (দাঁড়িয়ে) সভাপতি মিস্টার ব্যারোজ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত—মানে—

ব্যারোজ ॥ কি ব্যাপার স্বামীজি? আপনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?

বিবেক ॥ আমাকে যদি দয়া করে আর একটু পরে বলবার সুযোগ দেন—

ব্যারোজ ॥ আপনি এখন বলবেন না?

বিবেক ॥ না।

ব্যারোজ ॥ বেশ, আপনি আর একজন বক্তার পরে বলবেন। এবারে মহান্ জৈনধর্ম সম্পর্কে বলবার জন্য আমি মিস্টার বীরচাঁদ এ, গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

[নিজের আসন ছেড়ে মিস্টার গান্ধী মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি তার বক্তৃতা শুরু করেন।]

গান্ধী ॥ শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আমি আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করব না। আমার সম্মানিত বন্ধু মিস্টার মজুমদার এবং অন্যান্যদের মত আমিও সেই ভারতবর্ষ থেকে এই মহা ধর্মসম্মেলনে যোগদান করতে এসেছি, যে ভারতবর্ষ হল বিভিন্ন ধর্মের উৎসস্থল। আমি এই সম্মেলনে জৈনধর্মের প্রতিনিধিত্ব করব। এই জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের চেয়েও অনেক প্রাচীন। নীতির দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্মের সংগে এর সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে নেই। ভারতের অন্ততঃ পনের লক্ষ লোক এই ধর্মকে আশ্রয় করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। আপনারা অনেক প্রতিনিধির মূল্যবান বক্তৃতা শুনেছেন। অতএব পরবর্তী কোন অধিবেশনে জৈনধর্ম সম্পর্কে আমি বিস্তৃত আলোচনা করব। ভারতের সমগ্র জৈনসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এবং আমি যার প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছি বিশেষ করে সেই শ্রদ্ধেয় মুনি আত্মারামজীর পক্ষ

থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধর্ম-সমস্যা আলোচনার জন্য বিভিন্ন ধর্মের চিন্তাবীরগণ একই পতাকাতলে শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হবেন—এটা মনি আত্মারামজার সারা জীবনের স্বপ্ন। তাই, বিশ্ব ধর্মসম্মেলন আহ্বানের ব্যাপারে আপনারা যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তার জন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে এবং জৈন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ধন্যবাদ।

[কিছু শ্রোতা হাততালি দেয়। মিষ্টার গান্ধী আসন গ্রহণ করেন]

ব্যারোজ ॥ মিষ্টার গান্ধীর ভাষণ আপনারা শুনলেন। এবারে ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে আমি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে আহ্বান জানাচ্ছি—

বিবেক ॥ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি আপনার কাছে আর একবার সুযোগ চাই—

ব্যারোজ ॥ কি, বলুন ?

বিবেক ॥ দয়া করে আমাকে আর একজন বক্তার পরে বলবার অনুমতি দিন।

জনৈক শ্রোতা ॥ বেচারী নার্ভাস্ হয়ে পড়েছে।

অন্য এক শ্রোতা ॥ বোধ হয় বক্তৃতাটা মুখস্থ করে এসেছিল, এখন ভুলে গেছে।

অন্য এক শ্রোতা ॥ লিখে এনে পড়ে দিলেইত হত।

ব্যারোজ ॥ অর্ডার, অর্ডার, আমি এখন মিস্টার সি, এন, চক্রবর্তীকে দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

[মিস্টার চক্রবর্তি আসন ছেড়ে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করেন।]

চক্রবর্তী ॥ মাননীয় সভাপতি, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমি যে ধর্মবোধের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি তার জন্মলগ্ন সুদূর অতীতের এমন এক রহস্যে সমাচ্ছন্ন যে আধুনিক গবেষনার অনুবীক্ষনও সে রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয় নি। তার গভীরতা এত অধিক যে ইতিহাসের ওলন-দড়িও তার পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে চৈতন্যের প্রতীক হিসেবে গন্য হয়ে আসছে শুভ্র এবং জড়ের প্রতীক হিসেবে গন্য হয়ে আসছে কৃষ্ণ। আমি যে শহর থেকে এসেছি—অর্থাৎ এলাহাবাদ--সেখানে দুটি নদী একত্র মিলিত হয়েছে—একটি শুভ্র ও একটি কৃষ্ণ। আমার দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে যে ঐ পুণ্যভূমিতে জড় ও চৈতন্যের এক মহামিলন ঘটেছে। তাই যখন আমি ভাবি, জড়বাদের পীঠস্থান আর বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই শিকাগো শহরে আপনারা বিশ্বধর্মসম্মেলন আহ্বান করেছেন, যখন ভাবি যে বিচিত্র পার্থিব বিলাসের এই কেন্দ্রেও আপনারা যুক্তি আর আত্মানুভূতির এক মিলনস্থল গড়ে তুলেছেন, তখন আমার নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যায়। জড় ও চৈতন্যের যে মিলনানুভূতি,

সেই অনুভূতি হল ভারতীয় সাধনার মূল কথা। সেইটাই দিব্য জ্ঞান। আমি আশা করি এই বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে সেই সাধনার পথ উন্মুক্ত হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সংঘটিত হবে। ধন্যবাদ।

ব্যারোজ ॥ এবারে বলবেন স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেক ॥ আমাকে ক্ষমা করুন সভাপতি মহাশয়। আমি যেন বলার প্রেরণা পাচ্ছি না। ঈশ্বর যেন এখনও আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছেন না। দয়া করে আমাকে যদি আর একটা সুযোগ দেন—

জনৈক শ্রোতা ॥ এ তো বড় মজাদার লোক দেখছি।

অন্য একজন ॥ ভারতের কারবারই ঐ রকম। বেছে বেছে একটা লোক পাঠিয়েছে বটে।

ব্যারোজ ॥ অর্ডার, অর্ডার। আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে স্বামীজি ?

বিবেক ॥ আজ্ঞে না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

ব্যারোজ ॥ কিন্তু একটা কথা। আর একজনের পর আপনি যদি না বলেন, তবে আজ আর বলার সুযোগ পাবেন না।

বিবেক ॥ অশেষ ধন্যবাদ। এই শর্তে আমি রাজি।

ব্যারোজ ॥ এবারে ইংলণ্ডের চার্চ সম্পর্কে বলবেন লণ্ডনের শ্রদ্ধেয় ডক্টর মোমেরি।

[ডক্টর মোমেরি সভাস্থানে এসে বক্তৃতা সুরু করেন]

মোমেরি ॥ শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত ধর্মপিপাসু ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ বিখ্যাত হিউমরিস্ট

আর্টেমাস ওয়ার্ড-এর একটা ভারি সুন্দর কথা আমার মনে পড়ছে। কথাটা হচ্ছে এই, "আমি যখন নীরব থাকি তখনই আমার সব চেয়ে সুখ হয়।" এই বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে কিছু বলতে এসে আমারও অবস্থা হয়েছে ঐ আর্টেমাস ওযার্ড-এর মত। এখানে আমি বলব কি। এই মহান ধর্মসম্মেলনের পবিত্র গম্ভীর পরিবেশ শুধু নীরবে উপভোগ করার জিনিস। অতএব দু' একটা কথা বলেই আমি ক্ষান্ত হব। বার বার শুধু একটা কথা মনে হচ্ছে যে আমার আর্চ বিশপ এখানে উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে, আমি আপনাদের নিঃসন্দেহে জানাচ্ছি যে ইংলণ্ডের সমগ্র চার্চ আপনাদেরই সংগে আছে। আমি আরও বলতে পারি, বেঁচে থাকলে ওযেস্টমিনিস্টারের ডিন এই সম্মেলনে যোগ দিতেন এবং শুধু তাই নয় তিনি ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপকেও সংগে নিয়ে আসতেন। কেবলমাত্র ইংলণ্ডের নয়, পৃথিবীর সমগ্র চার্চই আপনাদের সহযোগী। এই সম্মেলনে সর্বধর্মের আলোচনা হবে, একথা ভাবলেই হৃদয়ে পবিত্র পুলক জাগে। সর্বশেষে মহান কবি টেনিসনের একটি কবিতার দুটি লাইন আবৃত্তি করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব ঃ

"সর্বত্রই রয়েছে সমগ্র পৃথিবী
আর ঈশ্বরের পায়ের সোনার শিকল
তাকে রেখেছে আবদ্ধ ক'রে।"

[হাততালি]

ব্যারোজ ॥ এবারে স্বামী বিবেকানন্দ বলবেন।

জনৈক শ্রোতা ॥ হয়ত আর একজন বক্তার পর উনি বলবেন।

বিবেক ॥ না মহাশয়, আর একজন বক্তা হয়ত আমার পরে বলবেন।

[শ্রোতাদের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। বিবেকানন্দ এবার বেশ ... সোজা হয়ে দাঁড়ান। তিনি চার সেকেণ্ডের জন্য তাঁর চোখ বন্ধ করে থাকেন। তারপর সহসা তাঁর ... মধুর ... কণ্ঠ ... ওঠে]

বিবেক ॥ আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ—

[এই বার ... সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ তুমুল করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে। নানারকম মন্তব্য শোনা যায়। "কি অপূর্ব! সম্বোধনে কি মহৎ শক্তি!" "ইনি একজন সত্যকার মহামানব। এর মধ্য দিয়ে যেন ভারতের আত্মা কথা বলছে।" সভাপতি ব্যারোজের মুখে স্নিগ্ধ মধুর হাসি ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে করতালি শান্ত হলে বিবেকানন্দ আবার বলতে শুরু করেন। প্রেক্ষাগৃহে উদগ্রীব স্তব্ধতা।]

বিবেক ॥ আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, আপনারা আমাদের যে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন তার উত্তরে কিছু বলতে গিয়ে আমার হৃদয় অবর্ণনীয় আনন্দে ভরে উঠেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত ধর্মের মূল উৎসের নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত সম্প্রদায় ও সমস্ত

শ্রেণীর কোটি কোটি হিন্দুর নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। যে ধর্ম পৃথিবীকে সহনশীলতা ও সর্বজনীনতার শিক্ষা দিয়েছে, সেই ধর্মের লোক বলে আজ আমি গর্ব অনুভব করছি। আমরা শুধু সর্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাসী নই, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে আমরা সত্য বলে গণ্য করে থাকি। যে জাতি অন্য ধর্ম এবং অন্য জাতির নির্যাতিত লোকদের আশ্রয় দান করেছে, সেই জাতির একজন মানুষ বলে আমি গর্বিত। বন্ধুগণ, লক্ষ লক্ষ লোক যে স্তোত্র প্রতিদিন আবৃত্তি করে, আমি আমার শৈশব থেকে যে স্তোত্র আবৃত্তি করে আসছি, তার কয়েকটি লাইন আমি আপনাদের শোনাব "বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন উৎসমুখ থেকে বেরিয়ে একই সমুদ্রে গিয়ে মেশে, তেমনি, হে ভগবান, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুসারে সাধনার যে বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলো সরল বা বক্র বা বিভিন্ন মনে হলেও শেষ পর্যন্ত সকলেই তোমাতে গিয়ে মিলিত হয়।" গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি চমৎকার কথা আছেঃ "যে যেভাবে আমার কাছে আসে, আমি তাকে সেই ভাবেই দেখা দিই। সমস্ত মানুষেরা বিভিন্ন ধারায় সাধনা করলেও শেষ পর্যন্ত সকলে আমার কাছেই আসছে।" সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কার—আর এই দুইয়ের মিলিত সৃষ্টি ভয়াবহ ধর্মান্ধতা সুন্দর পৃথিবীকে বহুদিন ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারা হিংস্রতা এনেছে, পৃথিবীকে নরশোনিতে

সিক্ত করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং বহু জাতির মনে এনেছে হতাশা। এই সব দৈত্যদের আবির্ভাব না ঘটলে মানব সমাজ আরো বেশি উন্নত হত। কিন্তু আজ তাদের অন্তিম উপস্থিত। আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি এই ধর্ম সম্মেলনের সম্মানার্থে আজ সকালে যে ঘণ্টাধ্বনি হয়েছে, সেই ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত ধর্মান্ধতা, তরবারি অথবা লেখণীর সাহায্যে সমস্ত অনাচার এবং মানুষে মানুষে সমস্ত শত্রুভাবের মৃত্যু ঘোষণা করবে। এই ধর্মসভার ওপর ঈশ্বরের আশির্বাদ বর্ষিত হোক।

[বিবেকানন্দের বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ তুমুল হাততালিতে ফেটে পড়ে। কলরব যেন আর থামতে চায় না। সভাপতি ব্যারোজ সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। প্রেক্ষাগৃহ থেকে নান রকম মন্তব্য ওঠে: "আরো বলুন স্বামিজী, আরো বলুন" "আমরা আরো শুনবো" "কি অপূর্ব কথা" "ভারতাত্মার বাণী" "এত ছোট বক্তৃতায় আমাদের আশা মিটছে না।" "ঈশ্বর প্রেরিত মহামানব" বিবেকানন্দ স্মিতহাস্যে সকলকে শান্ত হবার জন্য হাত দিয়ে ইংগিত করেন। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটে। দর্শকদের মধ্যে হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে মঞ্চে ওঠে। সকলে চীৎকার করে ওঠে তার বিরুদ্ধে। সে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। স্বামিজীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলতে থাকে।

ব্যক্তি ।। আমায় ক্ষমা করুন স্বামিজী, আমি মহাপাপী।

ব্যারোজ ॥ তুমি কে? মঞ্চে উঠে এলে কেন?

বিবেক ॥ কে, জোনাথান না?

জোনথান ॥ আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন?

বিবেক ॥ চিনবোনা কেন ভাই?

জোনাথান ॥ আমাকে আপনি ভাই বলে ডাকলেন? আমার পাপের কি মুক্তি আছে?

বিবেক ॥ পাপের জন্য সত্যকার অনুশোচনা হলে আর ত পাপ থাকে না।

জোনাথান ॥ আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন বলুন, তা নাহলে আমি শান্তি পাবনা।

বিবেক ॥ ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করেছেন। তুমি যে আমার ভাই।

[বিবেকানন্দকে জোনাথান দু'হাত ধরে তুলে বুকে চেপে ধরেন।]

ব্যারোজ ॥ ব্যাপার কি স্বামিজী?

জোনাথান ॥ একদিন রাস্তায় স্বামিজীকে আমি অপমান করেছিলুম। তার গায়ে হাত তুলেছিলুম। ঈশ্বর আমায় কেন এমন দুর্মতি দিয়েছিলেন! (ক্রন্দন)

বিবেক ॥ তোমার আত্মা জাগ্রত হয়েছে, আর ত তোমার ভয় নেই।

জনৈক শ্রোতা ॥ দেখছ, প্রকৃত সাধু একজন মানুষকে কেমন করে বদলে দেয়।

অন্যএকজন ॥ আমরা আপনার কথা আরো শুনতে চাই স্বামিজী।

অন্যএকজন ॥ নিশ্চয়

অন্যএকজন ॥ আপনি আরো অনেকক্ষণ বলুন।

বিবেক ॥ আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, দয়া করে শুনুন। এই সভায় বলবার জন্য আরো কয়েকজন বক্তা রয়েছেন। অতএব, আমি অন্য কোন অধিবেশনে আবার বলব।

জনৈক শ্রোতা ॥ না, না, তা হবে না। আমরা এখুনি আপনার কথা শুনতে চাই।

অন্যএকজন ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্য বক্তারা অপেক্ষা করুক।

ব্যারোজ ॥ ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গন, ভারতের মহান সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনে আপনারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, এটা খুবই আশার কথা। আপনারা যে অন্য ধর্মের প্রতি কতটা উদার, এটা তারই প্রমান। কিন্তু এই ধর্ম সম্মেলন যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে চলতে থাকে সে দায়িত্ব কি আপনাদের নয়? এই সম্মেলন কি আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে? যে উদারতা আপনারা স্বামীজীর প্রতি দেখিয়েছেন সে উদারতা কি এই সম্মেলনের প্রতি দেখাবেন না? আপনারা কি এতো কৃপন হবেন? এই সম্মেলন আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আরো অনেকগুলো অধিবেশন বাকি আছে। আজকে স্বামিজীকে আর অনুরোধ জানাবেন না। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আগামী কাল থেকে প্রত্যেকটি অধিবেশনের শেষ বক্তা থাকবেন ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ।

[এই কথা শোনামাত্র শ্রোতৃবর্গ "হুর্রা" "হুর্রা" বলে চিৎকার করে ওঠে। তাদের হাততালি চলতে থাকে।]

বিবেক ॥ (নিজের মনে বলে যান) হে ঈশ্বর, সম্মানে আর প্রশংসায় আমি যেন বিপথগামী না হই। এই বাণী তোমার। এই জয় তোমার। দীন, দুঃখী, মহৎ ভারত-বাসীর কথা আমি যেন না ভুলি। আমিত তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছি। হে ভগবান, তুমি ভারতবাসীকে দৈন্য থেকে মুক্ত করো, বন্ধন থেকে মুক্ত করো,—সর্বোপরি, তাদের ক্লীবত্ব আর ভয় থেকে মুক্ত করো। সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করো প্রভু।

তখন জনগণমন [illegible] গানের মধ্যে ধীরে ধীরে [illegible] পর্দা পড়ে।]

—শেষ—